# ভিক্টোরিয়া ভিলা

আগাথা ক্রিস্টি

# সূচিপত্র

০১. ....................................................................................................3
০২. ....................................................................................................14
০৩. ....................................................................................................26
০৪. ....................................................................................................38
০৫. ....................................................................................................47
০৬. ....................................................................................................61
০৭. ....................................................................................................81
০৮. ....................................................................................................92
০৯. ....................................................................................................100
১০. ....................................................................................................111
১১. ....................................................................................................115
১২. ....................................................................................................119
১৩. ....................................................................................................125

১৪. ..............................................................................................................134

১৫. ..............................................................................................................139

# ০১.

অবশেষে ডাক্তাররা আমাকে প্লাস্টারের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর তারা আমাকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করেছেন মনের সুখে, নার্সরা জ্ঞান দিয়েছেন যেন খুব সাবধানে হাত-পা গুলো ব্যবহার করি। ডাক্তার মার্কাস কেন্ট বলেছেন এবার যেন কোনো গ্রামে গিয়ে বসবাস করি। উত্তম হাওয়া শান্ত জীবন আর কর্মহীন থাকাই আমার একমাত্র প্রেসক্রিপশন। আমার বোন আমার দেখাশোনা করবে।

জবাব না পাওয়ার ভয়ে জিজ্ঞেসই করিনি, আবার আকাশে প্লেন নিয়ে উড়তে পারবো কিনা। গত পাঁচমাসে একবারও জিজ্ঞেস করিনি যে, আমাকে এরকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে কিনা।

আমি জানি পঙ্গু হওয়ার অবস্থা আমার হবে না। পা দুটো আমি ঠিক চালাতে পারব।

বড়ো খাঁটি ডাক্তার এই কেন্ট। তিনি বললেন, এখন বেশ বুঝতে পারছি, তোমার ঝটপট সেরে ওঠার জন্যে ধৈর্য্যচুতি হলে চলবে না। প্রশ্নটা যেখানে স্নায়ু আর পেশি শক্ত করার সেখানে মগজই শরীরকে মদত দেবে। এতদিন ধরে নানা ঔষধপত্রের ফলে তোমার স্নায়ু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে আর সেজন্যে তোমার গ্রামে গিয়ে শান্ত, সুস্থির জীবন-যাপন করো। গ্রামে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেল। পড়শীদের স্থানীয় কেচ্ছাগুলো উপভোগ করো।

অবশেষে তাই হল, জোয়ানা (আমার বোন) আর আমি বাড়ির দালালদের কাছে সারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সুন্দর বাড়ির তালিকা পাগলের মতো ঘেঁটে শেষে লিমস্টকের লিটলফার্জ বাড়িটা পছন্দ করলাম। ঐ অঞ্চলটা বা সেখানকার কাউকে আমরা চিনি না।

ছিমছাম একতলা, সাদা বাড়ি, ভিক্টোরিয়ার আমলের ঢালু, সবুজ রঙের বারান্দা।

এ বাড়ির মালিক বারটন পরিবারের সবাই অবিবাহিতা মহিলা, তাদের মধ্যে এখন একমাত্র জীবিতা সদস্যা কনিষ্ঠা মিস এমিলি বারটন। ছোটোখাটো মিষ্টি বুড়ি কেমন নরম সুরে জোয়ানকে বোঝালেন, এ বাড়িতে আগে কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়নি, পারলে কখনো দিতেনও না, কিন্তু এখন ট্যাক্সের বোঝা, স্টক আর শেয়ারের গচ্ছিত টাকা থেকে কিছুই প্রায় আয় হচ্ছে না। দিনকাল কত কঠিন হয়ে পড়েছে। আর তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে এ বাড়িটায় একটা নবীন জীবনের প্রয়োজন। তবে একটা কথা, এখানে কোনো বেটাছেলেকে থাকতে দিতে আমার আপত্তি আছে ভাই।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে জোয়ানা আমার ব্যাপারটা খুলে বলতেই মিস এমিলি সামলে নিয়ে বললেন, ওহো, বড়ো দুঃখের কথা! উড়তে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট? তাহলে তোমার ভাই তো প্রায় পঙ্গুই একরকম..

ধরেই নেওয়া যায় এমিলি বারটনের যা ভয় তেমন কোনো পুরুষোচিত কাজকর্ম আমি করি না। ভীরু কণ্ঠে এমিলি জানতে চায় যে আমি ধূমপান করি কিনা। জোয়ানা বলে, বাব্বা জাহাজের চিমনির মতো! তবে আমিও সিগারেট খাই।

–তা তো বটেই! আমারই বোকামি। বুঝলে ভাই, আমার বোনেরা সব বেশি বয়সের ছিলেন, মাও বেঁচে ছিলেন ৯৭ বছর অবধি। যথেষ্ট বাছবিচার ছিল। তবে হ্যাঁ, আজকাল সবাই ধূমপান করে। একটা ব্যাপার, এ বাড়িতে কোনো ছাইদানি নেই।

জোয়ানা বলে, ছাইদান আমরা অনেকগুলো আনবো।

অতএব ফয়সালা হলো। ছ-মাসের জন্যে আমরা ভাড়া নিলাম। আরো তিন মাসের আগাম ভাড়ার অভিপ্রায় জানানো রইল। জোয়ানাকে মিস বারটন জানালেন, এ বাড়ি ছেড়ে গেলেও তাঁর নিজের কোনো অসুবিধে হবে না। তারই এক পুরনো পরিচারিকা বিশ্বাসী ফ্লোরেন্সের হেপাজতে দু-কামরা ঘরে চলে যাবেন তিনি। ফ্লোরেন্স ওঁদের সঙ্গে পনেরো বছর বসবাস করে অবশেষে বিয়ে করেছে। স্বামী বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করে। হাই স্ট্রিটে সুন্দর বাড়ি বানিয়েছে। সেখানে খুব আরামেই থাকব।

চুক্তিপত্রে সই হলো। মিস এমিলির আগের ঝি প্যারট্রিজ রাজী হয়েছিল আমাদের সঙ্গে থাকতে। সে মাঝবয়সী, একটু মোটা বুদ্ধির একগুয়ে স্ত্রীলোক। তার তদারকিতে থাকতে পেরে আমরাও দায়মুক্ত হলাম। তবে দেরি করে রাত্রিভোজন সে পছন্দ করতো না।

লিটল ফার্জে থাকার এক হপ্তা পর মিস এমিলি একদিন তার নামের কার্ড রেখে গেলেন। তার দেখাদেখি উকিলপত্নী মিসেস সিমিংটন, ডাক্তারের বোন মিস গ্রিফিথ প্রায়র্স-এন্ডের মিঃ পাই ওরাও এসে যে যার কার্ড রেখে গেলেন।

চমৎকৃত জোয়ানা বলল, জানতাম না লোকে সত্যি সত্যিই এরকম কার্ড দিয়ে দেখা করে! জোয়ানার চেয়ে আমি বছর পাঁচেকের বড়ো। ছেলেবেলায় আমাদের বেঢপ, মস্ত সাদা অগোছালো বাড়িটার কথা মনে পড়ে। আমার বয়স যখন সাত, জোয়ানা তখন দুই, আমরা গেলাম লন্ডনে এক পিসির বাড়ি। এর পরে ক্রিসমাস, ইস্টারের ছুটিগুলো আমাদের কাটতে লাগল পুতুলনাচ, নৌ-বিহার আর স্কেটিং করে। আগস্ট মাসে আমাদের নিয়ে যাওয়া হত সমুদ্রের ধারে এক হোটেলে।

এখন আমার পঙ্গুত্বের কথা চিন্তা করে মনে আশঙ্কার খোঁচা লাগে। জোয়ানাকে বলি, এখানে থেকে তোকে কতকিছুই না খোয়াতে হবে।

কারণটা হল জোয়ানা বেশ সুন্দরী, স্ফুলিঙ্গ, নাচের আসরে ককটেল ভালোবাসে, প্রেম ট্রেম, জোরালো বেগে গাড়ি হাঁকানো সে পছন্দ করে। জোয়ানা হেসে বলে, এর জন্য তার কোনো হেরফের হবে না।

জোয়ানার প্রেমের ঘটনাগুলো প্রায় একই খাতে চলে বরাবর। একেবারে মেরুদণ্ডহীন ছোকরাগুলো যাদের কোনো প্রতিভা নেই, তাদের জন্যে সে প্রেমে পাগল হয়ে ওঠে। তাদের পরিচিতি দেবার জন্যে আপ্রাণ খাটে। তারপর তারা যখন অকৃতজ্ঞ বলে ধরা পড়ে তখন জোয়ানা মর্মাহত হয়। এই বুক ভেঙে যাওয়া ব্যাপারটা মোটামুটি তিনহপ্তা স্থায়ী হয়, যতক্ষণ না আবার একটি গোমড়ামুখো ছেলের আবির্ভাব হয় ওর জীবনে তাই জোয়ানার ভাঙা হৃদয়কে আমি তেমন গুরুত্ব দিই না।

তবে এটা খেয়াল করলাম আমার আকর্ষণকে বোনটির কাছে পাড়াগাঁয়ের জীবন যেন একটা নতুন খেলার মতো লাগছে।

সেদিন দেখলাম একটা স্কার্ট পরেছে উৎকট চেকে, তার ওপর ঝুলিয়েছে হাস্যকর একটা ছোটো হাতার জার্সি। পায়ে সিল্কের মোজা, আনকোরা ব্রোগ জুতো।

আমি বললাম, তোকে খাপছাড়া লাগছে। তোর উচিত ছিল, একটা টুইডের স্কার্টপরা আর সবুজ কিংবা রংচটা হলে আরো ভালো হত। সুন্দর উলের জাম্পার আর একটা কার্ডিগান তাহলে তুই লীমস্টকের পটভূমির সঙ্গে মিশে যেতে পারতিস।

জোয়ানা হেসে বলল, তুমি ভেবেছ ওরা আমাকে ভীষণ কিছু মনে করবে? আমি বললাম, না, ভাববে উড়ুটে।

আমাদের দর্শনাকাঙ্খী প্রতিবেশীর কার্ডগুলো এরমধ্যে পড়ে দেখতে শুরু করেছিল জোয়ানা। কোনো কারণে ভিকার পত্নীর কার্ডটাই তার দৃষ্টি কেড়েছে। হঠাৎ সোৎসাহে সে বলল, জেরি! যাই বলল, এটা বেশ মজার জায়গা। এখানে কোনো বাজে ব্যাপার ঘটতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না বলো?

জানতাম কথাটা ঠিক নয়, তবু ওর সঙ্গে একমত হলাম। ভাবতে আজব মনে হয় যে ঠিক একসপ্তাহ বাদেই আমরা সেই পয়লা নম্বর চিঠিটা পেলাম।

আমি শুরুটা ঠিকভাবে করিনি। লিমস্টকের কোনো বর্ণনাই দিইনি। জায়গাটা কেমন সেটা না বুঝলে আমার গল্পটা বোঝাই সম্ভব হবে না।

প্রথমেই বলি, লিমস্টকের মূল আছে অতীতের ইতিহাসে। নর্মান বিজয়ের সময় লিমস্টক ছিল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, তার প্রধান কারণ অবশ্য ধর্মীয়। একটা মঠে পরপর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও শক্তিশালী মঠাধ্যক্ষ দীর্ঘদিন কাজ চালিয়েছেন। আশপাশের গ্রামের লর্ড আর ব্যবসায়ীরা নিজেদের কিছু জমি ছেড়ে দিতেন মঠকে। লিমস্টকের মঠ তাই কয়েক শতাব্দী ধরে ধনে-মানে ফুলে ওঠে ক্ষমতা জাহির করছে। অবশ্য যথাকালে অষ্টম হেনরির পাল্লায় পড়ে তাদের ভাগ্য দাঁড়ায় অন্য সহযাত্রীদের মতো। সে সময় শহরে জাঁকিয়ে উঠেছিল একটা ঝড়। তবুও তারা তখন কিছু ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

অবশেষে ১৭০০ সাল বা কাছাকাছি সময়ে প্রগতির জোয়ারে লিমস্টক ভেসে গেলো পেছনের এদো খাঁড়িতে। ধসে পড়ল গড়। লিমস্টকের কাছাকাছি রইল না কোনো বড় সড়ক বা রেলপথ। একটা ছোটোখাটো গ্রাম্য বাজার শহর, জলাভূমি নিয়ে শান্ত আবাদ আর ক্ষেতজমি গজিয়ে উঠল।

সপ্তাহান্তে একদিন গরু ভেড়ার পালের হাট বসে। বছরে দুবার নাম না জানা ঘোড়াদের রেস হয়। একটা চমৎকার সদর রাস্তা (হাইস্ট্রিট) রয়েছে। একটা পোশাকের দোকান, ডাকঘর, দুটো কসাইখানা আর একটা আন্তর্জাতিক বিপণী। একজন ডাক্তার আর মেসার্স গ্যালব্রেথ এ্যান্ড সিমিংটন নামের আইন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি। একটা বিপুলায়তন গির্জা

১৪২০ সাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা স্কুলবাড়ি, দুটো শবখানা। এই হলো লিমস্টক। এমিলি বারটনের উস্কানিতে কেউ কেটা যেই হোক একবার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। এখানকার সবকিছুর মধ্যেই একটা নতুন মজার স্বাদ পাই। ডাক্তার কেন্টের উপদেশ মনে পড়ে স্থানীয় কেচ্ছাগুলো উপভোগ করবে কিন্তু সেসব কেচ্ছা আমার নজরে আসবে কোনদিক দিয়ে?

আজব ব্যাপার, চিঠিখানা যখন এল, তখন যে অন্য কিছুর চেয়ে আমরা মজাটাই পেলাম বেশি। চিঠিটা এসেছিল আমাদের প্রাতঃরাশের সময়ে। পরে খুলব ভেবে খামটা উল্টে রেখে দিয়েছিলাম। শুধু নজরে পড়েছিল ওটা একটা স্থানীয় চিঠি ঠিকানাটা টাইপ করা। লন্ডনের ডাক ছাপমারা বাকি দুখানা চিঠির আগে ওটাই প্রথম খুললাম, কারণ বুঝেছিলাম, লন্ডনের দুটোর মধ্যে একটায় আছে বিল, আরেকটায় আত্মীয়ের ঘ্যানর ঘ্যানর বকুনি।

চিঠি খুলে দেখি একখণ্ড কাগজের ওপর কিছু ছাপা অক্ষর আর শব্দ আঠা দিয়ে সেঁটে আটকানো। দু-এক মিনিট কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

জোয়ানা চমকে উঠে বলল, ওটা কী...কী ওটা?

অত্যন্ত অভব্য ভাষায় চিঠিটার লেখক বলতে চেয়েছে যে জোয়ানা আর আমি ভাই-বোন নই।

আমি প্রাথমিক চমক কাটিয়ে বললাম, ওটা একটা জঘন্য বেনামী চিঠি।

জোয়ানা উৎসাহে চঞ্চল হয়ে বলে, কী লিখেছে চিঠিটাতে?

এধরনের বেনামী চিঠি মহিলাদের দুর্বল স্নায়ুকে আঘাত করতে পারে তাই তাদের বাঁচাতে কেউ এ ধরনের জিনিস তাদের দেখায় না। আমার মাথায় এটা একেবারেই আসেনি তাই আমি ওর হাতে চিঠিটা দিয়ে দিলাম।

ও চিঠিটা পড়ে বলল, কি বিচ্ছিরি নোংরা চিঠি! এধরনের বেনামী চিঠি আগে কখনও দেখিনি। এগুলো কি এই ধরনেরই হয়?

-তা বলতে পারি না। তবে এ অভিজ্ঞতা আমারও এই প্রথম।

–ওরা হয়তো মনে ভেবেছে আমি কোনো ঘরছাড়া নষ্ট স্ত্রীলোক।

-সে তো বটে। আমাদের বাবা ছিলেন চৌকো চোয়াল, কালচেপানা, দীর্ঘ চেহারার মানুষ। আর মার নীল চোখ, হালকা কটা চুল, বেঁটেখাটো। এবার আমি দেখতে হয়েছি বাবার মতো আর তোর মিল মার সঙ্গে।

–ঠিক, একেবারেই মিল নেই আমাদের চেহারায়। কেউ ভাই-বোন বলে ভাববে না। তবে ব্যাপারটা একটা ভয়ানক তামাশা বলে মনে হচ্ছে।

সবচেয়ে ভালো, ঘেন্নার আওয়াজ করে ওটাকে আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া।

যেমন বলা, কাজটাও হল তেমনি। হাততালি দিয়ে উঠল জোয়ানা। তারপর ও বাইরের রোদে বেরিয়ে গেল। আমি প্রাতঃরাশের পরের সিগ্রেটটা ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, জোয়ানা ঠিক কথাই বলেছে, কেউ আমাদের এখানে আসাটা অপছন্দ করছে। হেসে উড়িয়ে দিলেই ভালো, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই মজার নয়।

সেদিন সকালে এলেন ডাক্তার গ্রিফিথ। তার সঙ্গেই সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করে শরীর পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলাম। গ্রিফিথকে আমার পছন্দই হয়। কেমন যেন থেমে থেমে কথা বলেন, লাজুক প্রকৃতির মানুষ।

জানালেন, আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। বললেন, আজ সকালে কি একটু ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছেন?

-না। ঠিক তা নয়। সকালের কফির সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের কুৎসাভরা বেনামী চিঠি পাই, বোধহয় তারই বিশ্রী স্বাদটা মুখে লেগে আছে।

উত্তেজিত মুখে ডাক্তার ধপ করে মেঝের ওপর হাতব্যাগটা রাখলেন। বললেন, বলতে চান আপনিও ঐ একইরকমই চিঠি পেয়েছেন?

–তার মানে? এরকম ব্যাপার কি চলছে?

–হ্যা কিছুদিন ধরে। কি লিখেছে চিঠিতে।

-ও, তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম, বাইরের লোক হিসেবে আমাদের এখানে আসাটা কেউ পছন্দ করছে না। যাই হোক, আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই। চিঠিটায় স্রেফ একথাই বলেছে আমি সঙ্গে করে যে শখের পায়রাটিকে এনেছি সে মোটেই আমার বোন নয়। সৎ বোনও নয়।

ডাক্তারের মুখখানা রাগে লাল হয়ে গেল। বললেন, কি ইতরামো! তবে কি জানেন, এসব বিকৃত মানসিকতা। মাথা নেড়ে সায় দিই, কে এর পেছনে আছে ধারণা করতে পারেন কিছু?

-না, তবে এটা একজন বিশেষ লোক বা কিছু লোকের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়া, মানে অভিসন্ধিমূলকই বলা চলে। সেক্ষেত্রে পত্রলেখকের কারুর প্রতি নির্দিষ্ট রাগ থাকে বা শোধ ভোলার জন্যে সে একটা জঘন্য কারচুপির রাস্তা ধরে। পত্রলেখক হয় কোনো খেদিয়ে দেওয়া ভৃত্য, নয়তো হিংসুটে স্ত্রীলোক এইরকম আর কি! এধরনের চিঠিগুলো এলোমেলো পাঠানো হয়, আর পাগলামিটা বেড়েই চলে।

গত বছর এই জেলার অন্য দিকটায় এরকম কিছু বিশ্রী ঘটনায় ধরা পড়ল একটা বড় পোশাক কারখানার মার্জিত রুচির শান্ত ধরনের এক মহিলা। আমি নিজে এরকম

একখানা চিঠি পেয়েছি। উকিল সাহেব সিমিংটন একখানা পেয়েছেন। এছাড়া আমার গরীব পেশেন্টদের মধ্যেও কেউ কেউ পেয়েছেন।

–সবগুলোই মোটামুটি এই ধরনের?

-হা হা। যৌন সম্পর্কের ওপরেই আসল বক্তব্য, সিমিংটনের চিঠিতে বলা হয়েছিল তিনি নাকি তার মহিলা কেরানীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছেন। বেচারি মিস গিঞ্চ, বয়েস চল্লিশ, খরগোসের মতো দাঁত উঁচু। সিমিংটন সোজা গেলেন পুলিশের কাছে। আমার চিঠিগুলোতে অভিযোগ, আমি আমার মহিলা রোগীনীদের সঙ্গে পেশাগত ভদ্রতা লঙ্ঘন করেছি। সবই স্রেফ ছেলেমানুষি, তবু বলব আমি ভয় পেয়েছি। আর কখনো কখনো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, বুঝলেন।

-তা তো বটে। আমার চিঠিটা অশিক্ষিত ধরনের লেখা, মনে হয় এমন কেউ লিখেছে যে বলতে গেলে লেখাপড়াই শেখেনি।

-তাই বুঝি? বলে গ্রিফিথ বিদায় নিলেন।

এই তাই বুঝি-কথাটা আমার মনকে বড় অশান্ত করে তোলে।

.

# ০২.

ঐ বেনামী চিঠি প্রাপ্তি মুখে একটা বিস্বাদ রেখে দিলেও অল্প কদিনে মন থেকে মুছে গেছে।

পরবর্তী ঘটনা ঘটল প্রায় এক হপ্তা বাদে। প্যারট্রিজ জানালো, আমাদের রোজকার কাজের মেয়ে বিয়েট্রিজ আজ আসবে না। কারণ স্যার, খবর পেলাম মেয়েটা একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমি ভাবলাম, বিয়েট্রিজের হয়তো পেটের গণ্ডগোল হয়েছে। তাই বললাম, দুঃখিত, তবে আশা করি শীগগিরই সেরে উঠবে। প্যারট্রিজ বলল, না স্যার, মেয়েটা ভালোই আছে, তবে একখানা চিঠি পেয়ে ওর মন অস্থির হয়ে পড়েছে...ওতে কিছু খারাপ ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্যারট্রিজের চোখের কঠিন ভাব আর ইঙ্গিত কথাটার ওপর বিশেষ জোর আমাকে শঙ্কিত করে তুলল–তবে কি আমাকে জড়িয়েই কোনো ইঙ্গিত। কিন্তু বিয়েট্রিজ সম্পর্কে আমি এতই অজ্ঞ যে ওকে শহরের মধ্যে দেখলে আমি চিনতেই পারব না। চটা মেজাজে বললাম, কী সব বাজে কথা বলছো?

মেয়েটির মাকে তো এ কথাটাই বোঝালুম। এ বাড়িতে আমার তদারকিতে কোনো কাণ্ডকারখানা কখনো ঘটেনি, ঘটবেও না। আর বিয়েট্রিজের ব্যাপার? আসল সত্যিটা হল, ও ঐ গ্যারেজের যে ছোকরাবন্ধুর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, সেও ঐরকম একটা নোংরা চিঠি পেয়েছে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, এমন ঘটনা আমি জীবনে কখনো শুনিনি।

–আমার মতে স্যার, ও মেয়েটাকে বিদায় করতে পারলেই ভালো। বলতে চাইছি, আগুন না থাকলে ধোঁয়াও থাকবে না।

তখন ভাবিনি ঐ শেষ প্রবাদটা আমায় পরে কী দারুণ হয়রান করে তুলবে।

.

সেদিন সকালে একটু অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজেই গ্রামের দিকে হেঁটে যাবো ঠিক করলাম। (যদিও লিস্টককে গ্রাম বললে স্থানীয় লোকেরা আমার ওপর খেপে যাবে, তথাপি জোয়ানা আর আমি গোপনে এটাকে গ্রামই বলি।)

জোয়ানাকে আমার সঙ্গে যেতে কড়াভাবে বারণ করেছি, বলেছি, মনে রাখিস, যে একলা চলে সেই চলে জলদি। এছাড়া গ্যালব্রেথ সিমিংটনে যাব শেয়ারগুলো সরিয়ে আমার ব্যাপারে সইসাবুদ করতে, রুটিওয়ালার কাছে গিয়ে কিছু রাস্টরুটির ব্যাপারে নালিশ

জানাব, ধার করা বইখানা ফেরৎ দেব। ব্যাঙ্কেও যাবো। ঠিক হল জোয়ানা গাড়ি করে আমায় তুলে নিয়ে আসবে যাতে লাঞ্চের সময়ে পাহাড়ে ফিরতে পারি।

আমি একাই এগোলাম। অবশ্য দুশো গজ যেতে না যেতে পিছন থেকে শুনি সাইকেলের ঘণ্টা, তারপর সজোরে ব্রেক কষতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেগান হাটার।

উঠে হাত-পা নেড়ে মেগান বলল, হ্যালো।

মেগান মেয়েটাকে আমার বেশ ভালোই লাগে। ও হল উকিল সিমিংটনের সৎ মেয়ে অর্থাৎ মিসেস সিমিংটনের আগের বিয়ের সন্তান। মিস্টার হান্টার নাকি বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর জুলুম চালাতেন। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই ঐ মহিলা ডিভোর্স নিয়ে ছোটো মেয়েটিকে নিয়ে লিমস্টকে বাস করতে শুরু করেন সব কিছু ভোলার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড সিমিংটনকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়ের ফলে হয় দুটি ছেলে, যাদের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত সিমিংটন দম্পতি। আমার ধারণা, মেগানের এক সময়ে এদের পরিবারে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো মনে হয়। তার মায়ের খর্বাকৃতি, ম্রিয়মান চেহারার সঙ্গে তার কোনো মিলই ছিল না।

মেগান ঢ্যাঙা, বয়স কুড়ি যদিও দেখায় ষোলোর মতো, একরাশ বাদামী চুল, সবুজ চোখের তারা, আর মন কাড়া হাসি। পোশাকে একটা অগোছালো ভাব। এক নিশ্বাসে হুসহুস করে কথা বলে।

-বুঝলেন, ল্যাশারদের ঐ খামার বাড়িটায় হাঁসের ডিমের আশায় গিয়েছিলাম। কী চমৎকার সব খুদে খুদে শুয়োরের বাচ্চা। কী মিষ্টি। আপনি শুয়োর পছন্দ করেন? আমার তো ওদের গন্ধটা অবধি ভালো লাগে।

-তাই বুঝি?

–দেখলাম আপনি একা শহরের দিকে হেঁটে চলেছেন, তাই ভাবলাম নেমে আপনার সঙ্গে হাঁটি। বড্ড আচমকা সাইকেল রুখেছি।

কিন্তু তোমার মোজা ছিঁড়ে ফেলেছ। তুমি কি মোজা টোজা সেলাই করো না? তুমি এখন বড়ো হয়ে গেছ, সেটাই বোধহয় বোবঝা না।

-মানে বলতে চান, আমার উচিত আপনার বোনের মতো সেজেগুজে পুতুল হওয়া? ও বড় সুন্দর। আপনি একেবারেই ওর মতো নন। তাই না?

-ভাই-বোন সবসময় একরকম দেখতে হয় না।

–তা সত্যি। আমি যেমন ব্রায়ান বা কলিনের মতো নই। আবার ব্রায়ান কলিনের নিজেদের মধ্যেও কোনো মিল নেই। বড়ো মগজ গুলোনো ব্যাপার...

–কি?

–এই আত্মীয় পরিবার। সংক্ষেপে জবাব দেয় মেগান। আমিও সায় দিয়ে বলি, তাই হয়তো।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম দুজনে। তারপর লাজুক হেসে মেগান বলল, আপনি বুঝি প্লেন চালান?

-হ্যাঁ।

–উড়তে গিয়ে জখম হয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, প্লেন ভেঙে পড়েছিল।

–এ তল্লাটে কেউ প্লেন চালায় না।

–মেগান, তুমি প্লেনে উড়তে চাও?

যেন অবাক হয়ে গেল মেগান। আমি? না না। অসুস্থ হয়ে পড়লে...ট্রেনে চড়লেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। তারপর একটু চুপ থেকে সরল শিশুর মতো বলে উঠল, আবার সেরে উঠলে প্লেন চালাতে পারবেন? নাকি ঠুটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে থাকবেন?

–আমার ডাক্তার বলেছেন, আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠবো। আমারও স্থির ধারণা আমি সেরে উঠবোই।

–তাহলে ভালোই। কিন্তু অনেক লোক বড় মিথ্যে কথা বলে। আমার ভয় ছিল আপনি বোধহয় চিরকালের মতো ঠুটো হয়ে থাকবেন, তাই আপনাদের অমন খাট্টা মেজাজ। তবে এটা স্বাভাবিক হলে অন্য কথা।

আমি শান্তভাবে বলি, আমি তো বদমেজাজী নই।

–তাহলে বলব, একটু তিরিক্ষি।

–তিরিক্ষি কারণ, তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার তাগিদ। কিন্তু এ ব্যাপারে তাড়াহুড়োটা তো কাজের নয়।

–তাহলে হুজুতি কেন?

–শ্রীমতি, কোনো কিছু তাড়াতাড়ি ঘটুক এ কি তুমি চাও না?

–না তা কেন চাইব? কোনো কিছু নিয়ে তাড়াহুড়ো করলে কিছুই ঘটে না।

–আমি প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলি, এখানে নিজেকে নিয়ে তোমার কীভাবে সময় কাটে বল তো?

করার আর কী আছে? চোখ কুঁচকে ও বলে।

–মানে, তোমার কোনো শখ-টখ নেই কিংবা খেলাধুলা করো না? অথবা বন্ধুবান্ধব নেই?

খেলাধুলা আমি ভালোবাসি না। এদিকটায় কোনো মেয়ে নেই, যাও বা আছে তাদের ভালো লাগে না। ওদের ধারণা বড় বদখট।

-বাজে কথা। তা কেন ভাববে ওরা?

মেগান মাথা নাড়ল।

স্কুলে যাওনি পড়তে?

–হ্যাঁ। বছরখানেক আগে ছেড়ে এসেছি।

–স্কুল তোমার ভালো লাগেনি?

-মন্দ ছিল না। যদিও শেখানো হত, কিন্তু এলোমেলো। এর একটু ওর একটু। সস্তার স্কুল, বুঝলেন, শিক্ষকরাও ভালো না। কোনো প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিতে পারতেন না। কিন্তু শিক্ষিত হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষকেরই সঠিক জবাব জানা উচিত। অবশ্য আমার মাথাটাও মোটা। তবু এত কিছু পড়ানো হয় যা আমার কাছে অখাদ্য মনে হয়। যেমন ধরুন ইতিহাস–একেকটা বইয়ে একেকরকম ব্যাখ্যা।

-আরে মজাটা তো সেখানেই।

–আর ব্যাকরণ; আজে-বাজে রচনা লেখা। শেলী, স্কাইলার্ক নিয়ে কিচিমিচি, তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেকপীয়ার।

-শেকস্পীয়র আবার কী গলতি করলেন? উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করি।

–একটা কিছু বলতে গেলেই জড়িয়ে পেঁচিয়ে এমন জটিল করে তোলেন যে তার নাগালই পাই না। তবু তার কিছু লেখা আমার ভালো লাগে।

–আর কোনো বিষয় তোমার ভালো লাগে না?

-হ্যাঁ, অঙ্ক। অঙ্ক তো দারুণ লাগতো, তবে তেমন ভালো করে শেখান হয় না। আমি চাইতাম সত্যিকারের গণিত শিক্ষা।

এবার আমরা হাইস্ট্রিটের মুখে এসে পড়লাম। মেগান তীক্ষ্ণস্বরে বলল, ঐ গ্রিফিথ আসছে। ওকে ঘেন্না করি আমি। ঐ হতচ্ছাড়া গাইডের দলে ভেড়াবার জন্য আমার পেছনে পড়ে আছে। ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল মিস গ্রিফিথ। একটু পোড়খাওয়া পুরুষালি ধরনের হলেও বেশ সুদর্শনা।

হেঁকে বললেন, এই যে দুজন। মেগান, তোমাকেই খুঁজছিলাম। কনজার্ভেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের জন্যে কিছু খামে ঠিকানা লিখবার লোক চাই।

মেগান বিড়বিড়য়ে কিছু বলেই সাইকেলে চলে সুট করে কেটে পড়ল।

তাকে লক্ষ্য করে গ্রিফিথ বললেন, অস্বাভাবিক হর্দ কুঁড়ে মেয়ে। ওর মা অনেকবার চেষ্টা করেছে ওকে একটা কিছুর মধ্যে লাগিয়ে দেবার–শর্টহ্যান্ড, টাইপ কিংবা রান্না-বান্না। কিন্তু ওকে নিয়ে ওর মায়ের দারুণ হতাশা। হ্যাঁ, সবাই তো এক ছাঁচের হয় না। আমি নিজের জীবন ভালোবাসি, তাই চাই যে অন্যরাও জীবনটাকে উপভোগ করুক। এই গ্রামদেশেই আমি সদাব্যস্ত, সবসময় সুখী। গ্রামে একটা না একটা কিছু ঘটছেই। গাইডদের নিয়ে, নানান কমিটি নিয়ে আমার সময় কেটে যায়।

ঠিক এই সময় মিস গ্রিফিথ রাস্তায় তার এক পরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে হাঁক পেড়ে ছুটলেন। আমিও রেহাই পেয়ে এগোলাম ব্যাঙ্কের দিকে।

আমি মিস গ্রিফিথের জীবনীশক্তির তারিফ করি। ব্যাঙ্কের কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে আমি চললাম, গ্যালব্রেথ অ্যান্ড সিমিংটনের দপ্তরে। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত আইনব্যাবসার পুরানো স্যাঁতসেতে গন্ধটা আমার নাকে ভালো লাগে। দেখলাম প্রচুর দলিল বাক্স রয়েছে, তাতে লেবেল সাঁটা লেডি হোপ, স্যার এভারার্ড কার ইত্যাদি।

যে দলিলগুলো আমি সঙ্গে এনেছিলাম, মিঃ সিমিংটন সেগুলো ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। ওঁকে খুঁটিয়ে দেখলাম, দীঘল গলা, কণ্ঠাস্থি উঁচু, পাংশু মুখমণ্ডল। নাকটা সরু লম্বা। নিঃসন্দেহে সৎ স্বামী ও পিতা।

একটু পরে মিঃ সিমিংটন ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের বক্তব্য বললেন। নিজের বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা। আমি এরপর বেরিয়ে এলাম। বাইরের অফিসে এক বুড়োমানুষ কিছু লিখে চলেছে। আর উসকোখুশকো চুল, চোখে চশমা একজন মাঝবয়সী মহিলা টাইপ করে চলেছে সবেগে, টেবিলে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে।

এরপর রুটিওয়ালার দোকানে গিয়ে কিউরাট রুটিটা সম্পর্কে একটু নালিশ শোনালাম। যথারীতি বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সঙ্গে সব শুনে দোকানদার একটা গরম রুটি আমার বগলে খুঁজে দিয়ে বলল, এই এক্ষুনি চুল্লি থেকে নামল।

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার এধার ওধার দেখতে লাগলাম জোয়ানার আসার অপেক্ষায়, কিন্তু জোয়ানার কোনো হদিশ নেই। হেঁটে যথেষ্ট ক্লান্ত বোধ করছি।

হঠাৎ আমার চোখদুটো অবিশ্বাস্য বিস্ময় আর আনন্দে দেখল এক সাক্ষাৎ দেবী যেন ফুটপাথ ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

নিখুঁত মুখশ্রী, কোঁকড়া সোনালি চুল, দীঘল সুগঠিত অঙ্গ। আমার এই গভীর উত্তেজনায় আমার মুঠো থেকে খসে পড়ল পাঁউরুটি আর একটা লাঠি। আর পিছলে গিয়ে আমিও পড়ি আর কি?

সেই দেবীর সবল বাহু আমাকে টেনে ধরল। আমি তোতলাতে লাগলাম–ধন্যবাদ অজস্র। আমি ভীষণ দুঃখিত।

মেয়েটা তার সদয় হাসির সঙ্গে উৎসাহ দিয়ে বলল, কোনো ধন্যবাদ নয়, আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি। আমি নজর করিনি, অথচ জোয়ানা কোনো সময় রাস্তার কোণে আমার পাশটিতে গাড়ি এনে দাঁড় করিয়েছে। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কিছু না এই ট্রয়ের হেলেন-টেলেনের কথা ভাবছিলাম।

–ওসব ভাবার কি আর জায়গা পেলে না? তুমি বগলে রুটি নিয়ে, হাঁ করে কিরকম বেখাপ্পা কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে।

–শক খেয়ে গিয়েছিলাম। একবার ট্রয় দর্শন করিয়েই আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। আমিও দূরে মিলিয়ে যাওয়া সুললিত ভঙ্গির দিকে দেখিয়ে বললাম, চিনিস নাকি? কে ও?

পেছন থেকে ভুরু কুঁচকে জোয়ানা বলল, ও সিমিংটনের বাচ্চাদের গভর্নেস। এই দেখে তুমি থ মেরে গেছ? দেখতে ভালো ঠিকই কিন্তু ভাদভ্যাদে।

–জানি সদয় সুশ্রী মেয়ে। আর আমি ভেবে বসেছিলাম প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোদিতে।

জোয়ানা গাড়ির দরজা খুলল, আমি ঢুকলাম। বলল, বেশ মজার ব্যাপার তাই না। কিছু লোকের রূপ আছে কিন্তু আবেদন একেবারেই নেই। তাদের দেখে বেশ দুঃখ হয় আমার।

-যদি মেয়েটা শিশুদের গুরুমা হয় তাহলে বোধহয় ঠিকই আছে।

.

# ০৩.

সেদিন বিকেলে আমরা মিঃ পাই-এর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে এসেছি।

ছোটখাটো, মোটাসোটা চেহারার মিঃ পাই একেবারেই মেয়েলি ধরনের। যে জমিতে সেই প্রাচীন প্রায়রির ধ্বংসাবশেষ তারই কক্ষের মধ্যে ওর বাসস্থান–প্রায়র্স লজ। নানা টুকিটাকি কারুশিল্প, সূক্ষ্মকাজের চেয়ার এইসব নিয়েই তিনি মশগুল।

মিঃ পাইয়ের বাড়িটি বড়ই মনোগ্রাহী ও খোলতাই। প্রতিটি আসবাব পালিশ করা এবং মানানসই জায়গায় বসানো। পর্দা আর কুশনগুলো দামী সিল্কের, অপরূপ তাদের কারুকার্য ও রং। এ বাড়িতে কারোর বাস করা মানে কোনো জাদুঘরের ঐতিহাসিক কক্ষে বাস করা।

–এখানকার এই ছোটো সমাজটার জন্যে যদি এমন এক সংগ্রহ রাখতে পারি তাতেই আমার আনন্দ। নিজের চোখে দেখেছি এইসব গ্রাম্য চাষাড়ে লোকগুলো একটা আঠারো শতকের শেরাটন চেয়ার–দুর্দান্ত নিখুঁত–যাকে বলে খাঁটি সংগ্রাহকের পিস..তো সেটা রাখা হয়েছে একটা যেমন-তেমন ভিক্টোরিয়া টেবিলের পাশে। তারপর ধরুন গাঢ় রংচড়ানো ওককাঠের বুকশেলফ, রং করা ওক? শুনেছেন কখনো? কেন লোকে কুৎসিত জিনিস দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখে?

-জোয়ানা বলে, ব্যাপারটা অদ্ভুত।

–অদ্ভুত? ক্রিমিনাল। অপরাধমূলক। এই ধরুন আপনারা যে বাড়িটা নিয়েছেন মিস এমিলি বার্টনের বাড়ি-বাড়িটা চমৎকার। দু-একটা জিনিসও রীতিমতো পয়লা শ্রেণীর। রুচিও আছে, তবে সে ব্যাপারে আমি আগের মতো নিশ্চিত নই।

মিঃ পাই এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো পরিবারটা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কিন্তু জানা থাকলে ভালো। আমি যখন আসি বুড়ি মাটি তখনও বেঁচে। বুড়ি রীতিমতো ডাইনি। গতরখানা তিনমন তো হবেই, আর পাঁচটি কন্যারত্ন চারপাশে ঘুরঘুর করছে। মেয়েদের সবসময় অর্ডার করে যেতেন আর মেয়েরা স্রেফ গোলামের মতো পালন করে যেত। মেয়েরা বিয়ে করছে না বলে গঞ্জনা দিতেন, অথচ ঐ মহিলা ওদের জীবনে এমন রাস্তাই রাখেনি যাতে ওরা কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। আমার ধারণা এমিলি কিংবা অ্যাগনেস কোনো গ্রাম্য যাদুকরের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পরিবারটি তেমন কিছু নয়, অতএব মা-ঠাকরুন অবিলম্বে বিয়েটা ভণ্ডুল করলেন।

–এ যে উপন্যাসের গল্প মশাই, জোয়ানা বলল।

-হ্যাঁ ভাই। উপন্যাসই বটে। অবশেষে বুড়ি গত হলেন। কিন্তু ততদিনে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। মেয়েরা ঐভাবেই জীবন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু তাদের দৈহিক শক্তি তেমন ছিল না। তাই এক এক করে বিদায় নিলো দুনিয়া থেকে। এডিথ ইনফ্লুয়েঞ্জাস, মিনি

একটা অপারেশনে বেচারী মেরেলের হলো স্ট্রোক। বেচারী এমিলি গত দশ বছর ধরে শুধু সেবাই করে যাচ্ছে, আজকাল সে অর্থচিন্তায় বড়ই কাতর...সব গচ্ছিত টাকারই মূল্য পড়ে যাচ্ছে।

–ওঁর বাড়িটা দখল করে আমাদের খারাপ লাগছে, বললে জোয়ানা।

–না না, ইয়ং লেডি ওভাবে নেবেন না ব্যাপারটা।

আমি বললাম, ভারি স্নিগ্ধ একটা আবহাওয়া আছে বাড়িটাতে।

-সত্যি, তাই অনুভব করেন নাকি? আমিও আবহাওয়ায় বিশ্বাস করি বুঝলেন। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি–দেয়ালে আসবাবপত্রে তার ছাপ রেখে যায়।

আমি দু-এক মুহূর্ত চুপ করে প্রায়র্স লজের চারদিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে হল, এখানে কোনো আবহাওয়া নেই। আর সেটাই আশ্চর্য।

এবার সবাই এলাম বাইরের হলঘরে। সামনের দরজার দিকে এগোতেই চিঠির বাক্সের ভেতর দিয়ে গলানো একটা খাম মেঝেতে পড়ল।

খামটা তুলে নিলো মিঃ পাই, বললেন, বিকেলের ডাক। তিনি আমাদের বিদায় জানালেন।

দু-দুবার করমর্দন করে তিনি আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন। জোয়ানা হুইলে বসল। নিখুঁত সবুজ একখণ্ড জমিতে সাবধানে চক্কর দিয়ে অবশেষে সামনের সোজা রাস্তায় উঠে সে হাত নেড়ে গৃহকর্তাকে বিদায় জানালেন।

কিন্তু আমাদের ইশারা ইশারাই রয়ে গেল।মিঃ পাই তার হাতের চিঠিটা খুলে ফেলেছিলেন। আর ভোলা কাগজটার দিকে মুখখানা কুঁচকে, রাগে আর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। পর মুহূর্তে অনুভব করলাম ঐ খামটার চেহারা যেন আমার চেনা চেনা। জোয়ানা বলল, কী ব্যাপার! ভদ্রলোকের হলোটা কি?

বললাম, আমি যেন আন্দাজ করছি...আবার সেই গোপন হাতের কাজ।

জোয়ানা আমার দিকে অবাক চোখে তাকালো। বলল, মানে, যে ধরনের চিঠি তুমি পেয়েছিলে সেইরকম একটা?

–আমার ধারণা তো তাই বলছে।

-এ জায়গাটার হলোটা কি! দেখলে তো মনে হয় দেশের সবচেয়ে শান্ত আর ঘুমন্ত এক প্রান্ত কিন্তু এসব কে লিখছে জেরি?

-বাছা, আমি তা কি করে জানবো?

হবে কোনো স্থানীয় আধপাগলা। তবে তুই আমাদের ডাক্তার আওয়েনকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।

–ডাঃ আওয়েন আমায় পছন্দ করে না। আমাকে হাইস্ক্রিট ধরে আসতে দেখলেই রাস্তার ওপারে চলে যান। কিন্তু জেরি, এই চিঠি লেখার ব্যাপারটা মোটেই তামাশার ব্যাপার নয়। কেন লোকে বেনামী চিঠি লিখবে?

-ঐ তো যা বলছিলাম। কোনো মানসিক তাড়নার তৃপ্তি খোঁজে বোধহয়। কেউ যদি ভাবে তাকে খাটো করা হয়েছে কিংবা অবহেলিত করা হয়েছে অথবা তার জীবনটা যদি হয়ে যায় একঘেয়ে শূন্য, তাহলে বোধহয় সে সুখী আর আনন্দে মশগুল কাউকে দেখলে পেছন থেকে ছুরি মেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয় জেরি।

–ভালো তো নয়ই। তবে এই দেশগাঁয়ে মানুষদের ভেতরমুখো হবার দিকে ঝোঁক–তাই কিছু বিকৃত আজব মানুষ দেখা যায়।

তার মানে খুব অশিক্ষিত, ভাবপ্রকাশে অক্ষম তাই না...

জোয়ানার কথার আমি আর কোনো উত্তর দিইনি।

পাহাড়ী রাস্তায় ওঠার আগে শহরের ভেতর দিয়ে আসার সময় কৌতূহলভরে দেখলাম হাইস্ট্রিটে বিচরণমান কয়েকটা অস্পষ্ট মূর্তি। ঐ ভীড়েই হয়তো কেউ ঈর্ষা আর কুটিলতার বিষ লুকিয়ে শান্ত মুখখানাকে আড়ালে রেখে আবার কোনো নতুন মতলব করছে।

.

দুদিন বাদে আমরা সিমিংটনদের বাড়িতে ব্রীজ খেলার পার্টিতে গেলাম। শনিবারের বিকেল। দপ্তর বন্ধ, এ কারণেই সিমিংটনরা বরাবরই শনিবারে ব্রীজের আসর বসান।

দুটো খেলার টেবিল। খেলুড়ে সিমিংটন দম্পতি, মিস গ্রিফিথ, আমরা দুজন, মিঃ পাই, মিস বারটন আর কর্নেল অ্যাপলটন যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি। বয়স তার ষাট। জোয়ানার দিকে তার আকর্ষণটা এমন বর্ধিত রূপ ধারণ করছিল যে বিকেলটা একবারও ওর ওপর থেকে নজর সরাননি।

যখন আমরা সেখানে পৌঁছালাম, তখন বাচ্চাদের গভর্নের্স এলসি হল্যান্ড ব্রিজ স্কোরের খাতা টেবিলের দেরাজ হাতড়ে খুঁজছে।

হাতে খাতা নিয়ে আর পাঁচটা ঝি-এর মতো বকবক করতে লাগল, এগুলোই বুঝি, মিসেস সিমিংটন? কি বোকা আমি, সেদিন প্রায়ান তার রেলগাড়িটা কোথায় খুঁজতে

থাকল, আর আমি নিশ্চয় এটাকে কোনো গলদ জায়গায় ঢুকিয়ে ওর কাছে ছুটেছিলাম। এগুলো ঠিক না। আমি বাচ্চাদের একটু লংব্যারোতে নিয়ে যাচ্ছি।

সুশীলা, সুশ্রী ঝলমলে মেয়ে। জোয়ানার দিকে তাকাতেই দেখলাম ও হাসছে। আমি কড়া চোখে ওকে দেখি।

ব্রীজ খেলতে বসলাম আমরা। শ্রীমতী সিমিংটন খুবই ওস্তাদ খেলুড়ে। তাঁর স্বামীও ভালো খেলেন, একটু অতিরিক্ত সতর্ক। মিঃ পাই তো ব্রিলিয়ান্ট। আজকের আসরের আয়োজনটা যেহেতু আমাদের সম্মানে তাই আমি আর জোয়ানা বসেছি সিমিংটন পত্নী আর মিঃ পাই-এর সঙ্গে এক টেবিলে। মিস বারটন দলের সবচেয়ে উঁছা খেলুড়ে, তবে খেলে দারুণ মজা পান।

খেলা এমনিতে ভালোই চলছিল, শুধু মাঝেমধ্যে জোয়ানার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে কর্নেল সাহেবের কিছু ভুলচুক হচ্ছিল। টেবিল ঘিরে চায়ের আসর বসল ডাইনিং রুমে। খাওয়ার শেষপর্বের সময় দুটো ছোট বাচ্চা হুড়মুড় করে ঢুকে এলো। ওদের পরিচয় দেবার সময় মিসেস সিমিংটন মাতৃগর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

মাথা ঘুরিয়ে দেখি মেগান আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওঃ!..এই হলো মেগান–বললেন ওর মা।

মেগান বেয়াড়াগোছের একটা করমর্দন করল, কোনো শোভনতাই নেই।

-বাছা, আমি তোর চায়ের কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। মিস হল্যান্ড আর ছেলেদুটো বাইরে খেয়ে নিয়েছে, তাই বাচ্চাদের চা হয়নি।

–ঠিক আছে, আমি নয় রান্না ঘরেই যাচ্ছি, মেগান বলল। ও কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একটা বিব্রত হাসি হেসে মিসেস সিমিংটন বললেন, এ আমার বেচারী মেগান। সবে স্কুল ছেড়েছে, ঠিকমতো বড়োও হয়নি, আনাড়ি গোছের।

দেখলাম জোয়ানা ঝা করে মিসেস সিমিংটনের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু মেগানের বয়স তো কুড়ি, তাই না?

-হা হা, তাই তো? কিন্তু বয়সের তুলনায় ও বড্ড বেশি কাঁচা। আসলে আমার ধারণা সব মায়েরাই তার ছেলেপিলেদের কোলের শিশু করে রাখতে চান।

আমি খেয়াল করলাম মিসেস সিমিংটনের ঐ পাংশু, ম্লান সুশ্রীতার পেছনে একটা স্বার্থপর, আগ্রাসী প্রকৃতি লুকিয়ে আছে। আমার বিরাগ ভাবটা আরো বেড়ে গেল যখন উনি বললেন, আমার বেচারী মেগান। মেয়েটা রীতিমতো ঝঞ্ঝাটে। চেষ্টা করছি কিছু একটা কাজের মধ্যে ওকে রাখতে তা ও কিছুই শিখবে না।

–তা ওর খাতিরে একটা নাচের মজলিশ করুন না? জোয়ানা কৌতুক করে বলল।

–নাচ? না না, ওসব জিনিস আমাদের এখানে চলে না। মিসেস সিমিংটন বললেন।

আমরা এরপর ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

জোয়ানা উগ্রভাবে এ্যাকসিলেটারে চাপ দেয়। গাড়ি প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে, মেগানের জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। ওর মাটা ওকে একেবারে দেখতে পারে না।

–আরে জোয়ানা, ব্যাপারটা অতো খারাপ কী আর?

-খারাপ নয়? এরকম অনেক মা-ই আছেন যারা বাচ্চাদের ভালোবাসেন না। অভিমান আছে এমন কোনো প্রাণীর মধ্যে এই বোধটা ভীষণ অসুখী ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। মেগান যথেষ্ট অনুভূতিশীল।

-হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা, বলে আমি চুপ করে রইলাম।

জোয়ানা খানিকক্ষণ বাদে দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল, ঐ গভর্নেসের ব্যাপারে তোমার ভাগ্যটাই খারাপ। যতবার ওর দিকে চেয়েছে তোমার চেহারার পুরুষসুলভ হতাশার ভাবটা আমি বুঝি লক্ষ্য করিনি? তবে তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমি একমত, অত রূপ, জলে গেছে।

-তুই কিসের কথা বলছিস আমি বুঝতে পারছি না।

–দেখতে তো সত্যিই ভালো মেয়েটা। অদ্ভুত, যে একটুও অন্য আবেদন নেই! এমন জিনিস যা কোনো মেয়ের আছে, কোনো মেয়ের আদৌ নেই। কোনো মেয়ে সামান্য কিছু বললেও পুরুষরা হাঁ করে তার কথা শুনতে চায়।

-জোয়ানা, তোর কথা শেষ হলো?

–আগে বল আমার কথা মানছো?

হার মেনেও মেনে নিচ্ছি।

তাছাড়া যুগ্যি আর কে আছে এখানে? হয়তো শেষে এমিলি গ্রিফিথকে বেছে নিতে হবে।

-ও তো আমার চোখে একটা পুরুষালি মেয়ে ছাড়া কিছু নয়। তোর নিজের বেলা কী করতে যাচ্ছিস শুনি?

-আমি?

–হ্যাঁ। তোরও তো একটু মুখ বদলাবার সময় এসেছে।

–তুমি পলের কথা ভুলে যাচ্ছো! জোয়ানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

–তুই আর দশটা দিন পরই বলবি, কে পল? কোন পল? কোনো পল-টল চিনি না।

–তুমি ওকে কোনোদিনই পছন্দ করোনি। কিন্তু ও সত্যি একটা জিনিয়াস গোছের ছিল।

–হয়তো ছিল, তবে আমার সন্দেহ আছে, ঐ জিনিয়াস লোকদের ঘেন্না করা উচিত। তবে তুই এ তল্লাটে একটাও জিনিয়াস খুঁজে পাবি না।

জোয়ানা আফশোসের সুরে বলল, তা হতে পারে না।

-তোকে শেষে আওয়েন গ্রিফিথেরই শরণ নিতে হবে, তবে তুই যদি কর্নেল অ্যাপল্টনকে বেছে নিস। সারা বিকেলটা তোর দিকে ভুখা কুত্তার মতো তাকিয়েছিল।

–ঠিক ধরেছে। আমার ভীষণ বিব্রত লাগছিল।

জোয়ানা নীরবে গাড়ি গেটের ভেতরে দিয়ে গ্যারেজের সামনে আনে।

জোয়ানা বলে, আমি বুঝি না কোনো লোক কেন ইচ্ছা করে এড়াবার জন্যে অন্য পথ ধরে? ব্যাপারটা অভব্য।

-ও তাই। লোকটাকে ঠান্ডা মাথায় তক্কেতক্কে থেকে শিকার করছি।

ধীরে ধীরে সাবধানে গাড়ি থেকে বেরিয়ে লাঠিদুটো সামলে নিই।

আমি কঠিন গলায় বলি, আমরা এখানে এসেছি একটু নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির খোঁজে যাতে তা পাই তাই দেখব। কিন্তু নির্ঞ্ঝাট শান্তি বোধহয় আমাদের কপালে ছিল না।

.

# ০৪.

হপ্তাখানেক পরের ঘটনা। প্যারট্রিজ এসে জানালো মিসেস বেকার আমার সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলতে চান।

মিসেস বেকার? কিছুতেই নামটার হদিশ করতে পারলাম না। মিস জোয়ানার সঙ্গে তো সে কথা বলতে পারে। কিন্তু পরে বুঝলাম, মিসেস বেকার হল বিয়েট্রিজের মা এবং আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি সম্মতি জানালাম।

বিশাল বপু, পোড়খাওয়া চেহারার মিসেস বেকার অনর্গল দ্রুতগতিতে বলে যেতে লাগল, আমি ভেবে দেখলাম স্যার, আপনি একমাত্র লোক, যিনি আমার এ অবস্থায় কি করা উচিত তা বুঝিয়ে বলতে পারেন।

-হ্যাঁ, নিশ্চয়...ইয়ে আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারলে খুশী হবো

মিসেস বেকার একটা চেয়ারে বসে বললেন, হ্যাঁ স্যার, আমিও চাইছিলাম আপনার কাছে আসতে। আর কিছু করাও দরকার, জানেনই তো আজকালকার ছেলেছোকরাদের মাথা গরম, কোনো কথাই শোনে না। আমি বিয়েট্রিজকে বলেছি–তাকে আচ্ছা মতো শিক্ষা দিতাম, আর ঐ মিল পাড়ার মেয়েটাও, কী বলেন?

আমি হতভম্বের মতো বললাম। দুঃখিত, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝছি না।

-ঐ তো, চিঠিগুলো স্যার। বিচ্ছিরি-নোংরা চিঠিগুলো। কথাগুলো কি নোংরা, ঐ একটাই পেয়েছিল। আর যার জন্য ওকে এ-বাড়ির কাজ ছাড়তে হলো।

আমি কিছু বলতে গেলাম কিন্তু মিসেস বেকার বাধা দিয়ে বলতে থাকলেন, আমাকে আর বলতে হবে না স্যার। ওতে যা লেখা ছিল তা ডাহা মিথ্যে কথা। আমি ভালোই বুঝি, আপনি ও জাতেরই নন স্যার, তার ওপর পঙ্গু। তবু মেয়েটাকে বলি এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দিতে। একটা সমর্থ্য মেয়ে কতো সাবধান হতে পারে?

মিসেস বেকার আবার দম নিয়ে শুরু করল, ভেবেছিলাম, এবার বোধহয় বিষ ছড়ানো বন্ধ হলো কিন্তু জর্জ মানে ঐ গ্যারেজের ছেলেটা যার সঙ্গে বিয়েট্রিজ ঘোরাফেরা করত, সেও পেল ঐ রকম একটা চিঠি। যাতে লেখা ছিল, বিয়েট্রিজকে নিয়ে নাকি ফ্রেন্ড লেডবেটারের টম ফস্টিনস্টি করছে–আমি হলফ করে বলতে পারি স্যার, ও ভদ্রতা করেই যা একটু কথাবার্তা বলে ওনার সঙ্গে।

-আমার মাথাটা গুলিয়ে যেতে লাগল, বললাম, দাঁড়ান, বুঝে নিই ব্যাপারটা। বিয়েট্রিজের... হয়ে জোয়ান বন্ধু..বেনামী চিঠি পেয়েছি যাতে অভিযোগ বিয়েট্রিজ অন্য ছেলের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়েছে, এই তো?

–ঠিক স্যার..আর তাতেই ঐ ছোকরা রেগে আগুন। বিয়েট্রিজ বলেছে, মিথ্যে কথা, কিন্তু ছেলেটা বিশ্বাস না করে মেজাজ দেখিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আর বেচারী বিয়েট্রিজ...ওকে এতো ভালোবাসতো...তাই স্যার আপনার কাছে ছুটে এলাম।

–তা আমার কাছে এসেছেন কেন?

-স্যার আমি জানি আপনিও ওরকম একটা চিঠি পেয়েছেন, তাই ভাবলাম স্যার আপনি তো লন্ডনের মানুষ, আপনি জানেন ওগুলো নিয়ে কি করতে হয়।

-আমি আপনার জায়গায় হলে পুলিশের কাছে যেতাম।

-না স্যার। পুলিশের কাছে যেতে পারবো না। কখনো পুলিশের সঙ্গে মেলামেশা করিনি, ও জিনিস আমরা কেউ কখনো করিনি।

–আমি তো আপনাকে শুধু এই পরামর্শ দিতে পারি।

মিসেস বেকার চুপ। আমার কথা শুনে তার একেবারেই মনঃপুত হয়নি। তখন আমি সামনে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করি, মিসেস বেকার, আপনার কোনো ধারণা আছে, এ ধরনের চিঠিগুলো কে লিখেছে?

ভেবেছিলাম কোনো নাম উল্লেখ করতে অনিচ্ছুক হবেন মহিলা, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে ঝপ করে বলে মিসেস ক্লিট...আমাদের সকলের ধারণা স্যার, ঐ মিসেস ক্লিটই, কোনো সন্দেহ নেই।

–ক্লিট? মিসেস ক্লিট কে?

জানলাম, একজন বুড়ো ঠিকে বাগানমালীর স্ত্রী। মিলের দিকে যাবার রাস্তায় এক কটেজে থাকে।

অবশেষে তাকে বিদায় দিয়ে তার কথাগুলোই ভাবছিলাম। ঠিক করলাম, গ্রিফিথের কাছে গিয়ে সব ব্যাপরটা আলোচনা করব। সে তো ক্লিটকে চেনে।

অবশেষে গ্রিফিথের সার্জারির কাজ-শেষের সময়টা আন্দাজ করে তার সঙ্গে দেখা করলাম।

–ও হো, বার্টন যে?

আমি মিসেস বেকারের সঙ্গে কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে তাকে আমার ধারণাটিও জানিয়ে দিলাম।

গ্রিফিথ আমাকে হতাশ করে জানালো, ব্যাপারটা অতো সরল নয়। তুমি জানো না, মিসেস ক্লিটকে এ অঞ্চলের সবাই ডাইনি মনে করে।

–কি আশ্চর্য! আমি অবাক হই।

-হ্যাঁ ভাই! এ যুগে শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। মিসেস ক্লিট এসেছে এক দিব্যজ্ঞানী পরিবার থেকে। এই অস্বাভাবিক, কিংবদন্তী মহিলা খুব সহজেই–কোনো বাচ্চা নিজের আঙুল কেটে ফেলেছে কিংবা আছাড় খেয়েছে কিংবা মাম্পসে ভুগছে, তো সে মাথা নেড়ে বলে দেয়, হবে না! খারাপ অভিশাপের হাত থেকে বাঁচতে মহিলারা ঘরে তৈরি কেক বা মধু এনে মিসেস ক্লিটকে দেয়। কুসংস্কার আর বোকামি জেনেও ওরা এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে আর ভেবে নিয়েছে সেই এ-সবের গোড়ায়।

–মিসেস ক্লিট যদি জড়িত না থাকে তাহলে চিঠিগুলো সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা—

না বার্টন, কিছুই জানি না। তবে এর থেকে কোনো ক্ষতি হতে চলেছে।

বাড়ি ফিরে দেখি মেগান হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে সিঁড়িতে বসে আছে। বলল, আপনাদের এখানে দুপুরের খাবার খেতে পারি?

নিশ্চয়। বলে আমি রান্নাঘরের দিকে প্যারট্রিজকে জানিয়ে দিতে গেলাম। প্যারট্রিজ একবার জোরে নাক টেনে বুঝিয়ে দিল এই মেগান সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু নয়।

আমি ফিরে এসে বললাম, আইরিশ স্টু হচ্ছে।

মেগান তার ধুলোমাখা পা-দুখানা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি নিজে মোজা রিপু করেছি।

আমি দেখলাম বিপরীত রঙের উলের একটা দলাপাকানো অংশই রিপু বলে ঘোষিত হয়েছে।

মেগান বলল, ফুটোর চেয়ে এটাই বেশি কষ্টকর।

-তাই মনে হচ্ছে। আমি সায় দিলাম, দুজনে চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ সাহচর্যময় নীরবতা।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ঝাঝালো গলায় মেগান বলে উঠল, আর সকলের মতো আপনিও নিশ্চয় আমাকে ভয়ানক কিছু মনে করেন?

আমি আরাম করে পাইপ টানছিলাম। ওর কথায় চমকে আমার পাইপখানা মুখ থেকে খসে পড়ল আর ভেঙে গেল। রাগ সামলে বললাম, দেখ তো কি করলে!

ও দন্তবিকশিত করে হেসে বলল, আপনাকে আমার ভালোই লাগে।

আমি ভাঙা পাইপের অংশগুলো তুলতে তুলতে বললাম, হ্যাঁ, কি যেন বলেছিলে?

আপনি কি আমাকে ভয়ানক কিছু ভাবেন?

-কেন সেরকম ভাববো?

কারণ আমি তো তাই।

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম, বোকার মতো কথা বলো না।

–সেটাই তো কথা, মেগান মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, লোকে আমাকে বোকা ভাবে। কিন্তু সত্যিই আমি বোকা নই। আমি ওদের ঘেন্না করি।

মেগান ওর বিষাদমাখা, কিন্তু শিশুসুলভ নয় চোখে আমার দিকে তাকায়। বলে আমার মতো হলে আপনিও মানুষকে ঘেন্না করতেন। যদি কেউ আপনাকে না চাইত

–মনটা বেশ উগ্র বিকারের দিকে ঝুঁকেছে বলে আন্দাজ হয় না তোমার?

–হ্যাঁ, লোকে ওরকমই ভাবে। ব্যাপারটা তো ঠিকই। মা আমাকে পছন্দ করে না। আমি বোধহয় তাকে আমার সেই নিষ্ঠুর বাবার কথাই মনে করিয়ে দিই। লোকের কথায় যা বুঝি, বড়ো ভায়ানক লোক ছিলেন তিনি। বেড়ালেরা যে বাচ্চাটিকে পছন্দ করে না তাকে

খেয়ে ফেলে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না, তাকে পুষতেই হয়। আসলে মায়ের ইচ্ছে আমার সত্বাপ আর ছেলে দুটোকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতা।

তাহলে তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে গিয়ে কোনো কিছুর একটা ট্রেনিং নিয়ে, নিজস্ব জীবন বেছে নিচ্ছ না কেন। যেমন শর্টহ্যান্ড-টাইপ কিংবা বুককিপিং

-ওসব আমি পারব বলে মনে হয় না। তবে কেন আমি চলে যাবো। কেন আমায় যেতে বাধ্য করা হবে? ওরা আমাকে না চাইলেও আমি থাকবো। থাকবো আর প্রত্যেক হতচ্ছাড়া শুয়োরগুলোকে কাদাব। আমি গাধা? আমি কুচ্ছিত? আমি এই লিমস্টকের প্রত্যেকটা লোককে দেখিয়ে দেব।

একটা অর্বাচীনসুলভ, বেয়াড়া, করুণ রাগ।

বাড়ির কোণে পায়ের শব্দ হতেই ওকে ধমক দিয়ে বলি, যাও ড্রয়িংরুমের ভেতর দিয়ে ওপরে গিয়ে বাথরুমে চোখ-মুখ ধুয়ে এসো। জলদি। মেগান অদ্ভুত একটা লাফ মেরে চলে গেল। জোয়ানা ততক্ষণে কোণের দিকটা থেকে সামনে এল।

উঃ কি গরম পড়েছে। বলে জোয়ানা আমার পাশে বসে পড়ল।

–আমারও তাই মনে হচ্ছে। ভালো কথা, আজ দুপুরে মেগান এখানে খেতে আসছে।

–সত্যি? বেশ তো! মেয়েটাকে পরীতে পেয়েছে। বুঝলে, পরীরা ওকে দোরগোড়ায় ফেলে রেখে আসল মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছে। ভারী মজার ব্যাপার। উফ, এবার যাই, গা ধুয়ে আসি।

-তা তো পারবি না, মেগান বাথরুমে আছে যে! বলতে বলতে মেগান বাথরুমের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল। এখন তাকে বেশ শান্ত, পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। সংশয়ভরা চোখে সে জোয়ানাকে দেখল।

-হ্যালো, তুমি লাঞ্চে এসেছো জেনে খুশী হলাম। চলো, চলো, ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার। জোয়ানা বলল।

ও মেগানের একটা হাত ধরে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

.

.

# ০৫.

আমার গল্পের মধ্যে একটা বিষয় বাদ পড়ে গেছে, সেটা হল মিসেস ডেন কলপ অথবা তার স্বামী রেভারেন্ড কালেব ডেন কলপের কথা যৎসামান্য উল্লেখ করলেও বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

অথচ ভিকার সাহেব ও তার স্ত্রী এখানকার বিশিষ্ট চরিত্র। ভিকার সাহেব দৈনন্দিন জীবনে নির্লিপ্ত থেকে বইপত্র, পড়ার ঘর আর প্রাচীন চার্চ সংক্রান্ত ইতিহাসের গভীর জ্ঞানের মধ্যে ডুবে থাকেন। তার স্ত্রী কিন্তু উল্টো, সবকিছুর মধ্যেই তিনি হাজির। গতানুগতিক ভিকার পত্নীদের মতো তিনি নন। তিনি কখনো কোথাও নাক গলান না অথচ কোনো অদ্ভুত ক্ষমতায় সব কিছু জেনে ফেলেন। কোনো উপদেশ দেন, তবু বিবেক পীড়িত যেকোনো মানুষের কাছে তিনি যেন ওপরওয়ালার প্রতিনিধি। গ্রামের প্রতিটি মানুষ তাকে কিছুটা ভয় করে চলে। লম্বা রোগাটে বিনীত মুখখানা, এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলেন যেন সবকিছু উড়েফুড়ে দেবেন।

মেগান লাঞ্চ খাওয়ার পরের দিন উনি আমায় ধরলেন হাইস্ট্রিটে।

–ওহো। মিস্টার বার্টন। বললেন তিনি, এমন বিজয়গর্বে যেন একটা বিশেষ কঠিন ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছেন।

আমি পরিচয়ের সমর্থন দিতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, কী জন্যে যেন আপনাকে খুঁজছিলাম? কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, হ্যাঁ, কোনো একটা বিশ্রী জিনিসের কথা।

ভড়কে গিয়ে বললাম, বুঝলাম না, দুঃখিত।

এবার কলপ চেঁচিয়ে উঠলেন, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বেনামী চিঠি! এসব কি গল্প আপনি আমদানী করেছেন বেনামী চিঠির ব্যাপারে?

–আমি আমদানী করিনি। এখানে আগে থেকেই চলছিল।

–তবুও আপনি আসার আগে তো কেউ এসব পায়নি, অভিযোগের সুরে বললেন ভদ্রমহিলা।

–মিসেস কলপ, ঝামেলা তো আগেই শুরু হয়েছিল।

-ওঃ, তাই বুঝি! আমার মোটেই এসব ভালো লাগছে না। ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা ঐ জাতের ছোটোখাটো পাপ তো আছে, কিন্তু এ ধরনের কাজ করবার মতো এখানে কেউ আছে বলে ভাবিনি। বুঝলেন–অন্তত আমার তো জানার কথা নয়।

এবার একটা উদ্বেগ, শিশুর মতো সরল হতবুদ্ধিতা যেন ওঁর চোখের মধ্যে লক্ষ্য করলাম। বললেন, কিন্তু আপনিই বা জানবেন কী করে? কালেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, সে

হল পুরোহিতের কর্তব্য। কিন্তু তার স্ত্রীর কর্তব্য হল, লোকে কী ভাবে, কী বোঝে সেটুকু জানা। সে এ ব্যাপারে কিছু করতে না পারলেও, এটা তো ধারণা করতে পারে যে কার মগজ কাজ করেছে এর পেছনে

হঠাৎ কথাটা বন্ধ করে আনমনা জুড়লেন, তাছাড়া এমন গোমুখের মতো চিঠিগুলো।

সামান্য সংকোচ, ইতস্তত করেও আমি জিজ্ঞেস করে ফেলি, আপনি...মানে...ইয়ে...আপনিও কি এমন চিঠি পেয়েছেন?

উনি চোখদুটো বড়ো করে বললেন, ও হ্যাঁ, দুটো..না তিনটে। ঠিক মনে পড়ছে না কথাগুলো তবে, কালেব আর স্কুল মিস্ট্রেসকে নিয়ে অতি বোকা বোকা, উদ্ভট কথা। কারণ কালেবের কোনো দিনই ব্যাভিচারের দিকে কোনো প্রবণতা ছিল না। বেশি রকম বই ঘেঁষা না হলে কালেব তো রীতিমতো সাধুই হয়ে দাঁড়াত।–ঠিক কথা, ঠিকই।

এবার মিসেস কলপ রহস্যময় উপায়ে স্বামীর প্রসঙ্গ থেকে চিঠির প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, কতো কিছুই আছে, যা ঐ চিঠিগুলো বলতে পারত, কিন্তু বলেনি। এটাই আশ্চর্য লাগে।

অখুশীভাবেই বলি, কেউ চিঠিগুলোতে সংযত থেকে ভুল করেছে, এমন কথা আমি ভাবতেই পারি না।

–তারা কিন্তু আসল ঘটনা কিছুই জানে না। এখানে গোপন কলঙ্কের তো সীমা নেই। চিঠির লেখক সেগুলো কেন ব্যবহার করে না? এবার বলুন আপনার চিঠিতে কী লিখেছিল।

-ইঙ্গিত দিয়েছিল, আমার বোন আমার বোনই নয়।

মিসেস কলপ উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলেন, সে তো আপনার বোনই?

নিশ্চয়ই, জোয়ানা আমার বোন।

—তাহলেই দেখুন, আমি যা বলতে চাইছি। এরকম আরো ব্যাপার আছে যা বলতে পারি –তিনি আমার দিকে নির্মল, নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকলেন।

প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু গোপন অধ্যায় আছে। আমার মনে হয় মিসেস কলপ তা সবই জানেন।

হঠাই শুনলাম এইমি গ্রিফিথের দরাজ কণ্ঠ গমগম করে উঠল-হ্যাল্লো মর্ড! ভালোই হলো তোমাকে ঠিক সময়ে ধরতে পেরেছি। হাতের কাজের জিনিসগুলো বিক্রির তারিখটা বদলাতে চাইছি। মর্নিং, মিঃ বার্টন। তোমার অসুবিধা না থাকলে দুজনে একটু ইনস্টিটিউটে যাবো। কেমন?

-হা হা, কোনো আপত্তি নেই, বললেন মিসেস কলগ্রুপ।

এইমি আন্তর্জাতিক বিপণীতে ঢুকলে, মিসেস কলপ বললেন, বেচারী। আমি অবাক হলাম তিনি এইমির জন্যে করুণাববাধ করছেন না। আবার বলতে শুরু করলেন, অন্ধ ঘৃণা, হ্যাঁ অন্ধ ঘৃণা...ঐ চিঠিগুলো বুঝলেন, ঐ অন্ধও দৈববশে কারুর হৃদপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।...আর তখন কি ঘটবে, মিঃ বার্টন?

আরেকটা দিন কেটে যাবার আগেই তা জানার দুর্ভাগ্য হল আমাদের।

.

শোকসংবাদটা প্রথম নিয়ে এলো প্যারট্রিজ।

জোয়ানা কামরায় জানলার পর্দা তুলে দিতে দিতে সে মুখে একটা অতিরিক্ত বিষাদের ভঙ্গিতে বলল, আজ সকালে একটা ভয়ানক খবর আছে, মিস।

লন্ডনের অভ্যাসমতো জোয়ানার ঘুম ছাড়তে দু-এক মিনিট সময় লাগল। বলল, এমন কী ভয়ানক খবর?

-বেচারী মিসেস সিমিংটন মারা গেছেন।

–আঁ, মারা গেছেন? জোয়ানা বাস্তবিকই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে খবরটায়।

-হা মিস, কাল বিকেলে। আরো যেটা খারাপ, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। যদিও অবশ্য মনে হয়, তিনি দায়ে পড়ে মরণ ডেকেছেন। বেচারী!

দায়ে পড়ে মরণ? জোয়ানা বলে, ইয়ে নয় তো?

–হা গো তাই..ওই রকমই একটা নোংরা চিঠি।

প্যারট্রিজের আফশোস যে সে-খবরটা সে সংগ্রহ করতে পারেনি।

এরপর একটা ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে ও আমার ঘরে এল খবরটা দিতে। আমার আওয়েন গ্রিফিথের কথা মনে পড়ল, আজ হোক কাল হোক, অন্ধকারে মোক্ষম জায়গায় তীর গিয়ে বিধবেই। তাই ঘটেছে মিসেস সিমিংটনের বেলায়। বাইরে থেকে অভাবনীয় মনে হলেও মহিলার হয়তো কিছু গোপন দিক ছিল।

জোয়ানা আমাকে বলল, তোমার কোনো আপত্তি নেই যদি মেয়েটাকে মানে মেগানকে। আমাদের এখানে দু-একদিন থাকতে চায়? বাচ্চাগুলোর তো সমস্যা নেই? ওদের গভর্নেন্স আছে। তবে আমার ধারণা ও যে ধরনের চীজ, মেগানের মতো মেয়েকে পাগল করে ছাড়বে।

মেগানকে এখানে আনার কথা আমারও মনে হচ্ছিল, কিন্তু জোয়ানা নিজের থেকে কথাটা পেড়েছে বলে আমি খুশী হলাম।

প্রাতঃরাশের পরে আমরা সিমিংটনের বাড়ি গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে ওদের গেটের মুখে আওয়েন গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে চিন্তিত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

–বার্টন, ভালোই হলো তুমি এসেছে। একদিন যা ঘটবেই বলে আমার ভয় ছিল, সেটাই ঘটল। বড়ো দুঃখের ব্যাপার।

-গুডমর্নিং ডক্টর গ্রিফিথ! জোয়ানা বলে উঠল।

গ্রিফিথ হকচকিয়ে লাল হয়ে বলল, ওঃ হো গুড মর্নিং, মিস জোয়ানা।

–আমি ভাবলাম আমাকে দেখতেই পাননি।

–খুবই দুঃখিত, আসলে মনটা অন্য দিকে ছিল তো তাই..

–হ্যাঁ, হবেই তো, হাজার হলেও আমি প্রমাণ সাইজের মানুষ

আমি জোয়ানাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে গ্রিফিথের দিকে মন দিলাম। ওকে বললাম, গ্রিফিথ, শোন, আমরা ভাবছিলাম, মেগানকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে দু-একদিন

আমাদের কাছে রাখলে মিঃ সিমিংটন কিছু ভাববেন? তোমার কী মনে হয়? আসলে এখানকার পরিবেশ মেয়েটার পক্ষে বেশ দুঃসহই মনে হয়।

–আমার তো মনে হয় ভালোই হবে। একটু বেয়াড়া গোছের অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে তো, এখান থেকে দূরে রাখাই ওর পক্ষে ভালো হবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বলি, ব্যাপারটা তো–আত্মহত্যাই?

–তা তো বটে। অ্যাকসিডেন্টের মতো কিছু নয়। উনি এক টুকরো কাগজে লিখে গেছে, আমি আর পারছি না। আর চিঠিটা এসেছিল কাল বিকেলের ডাকে। খামখানা তার চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর পড়েছিল আর চিঠিখানা দলা পাকিয়ে চুল্লিতে ফেলা হয়েছিল।

আমি তোতলামি করে বলি, কী বলেছিল...মা...মানে মাপ চাইছি।

–জিজ্ঞেস করে দোষের কিছু করোনি। চিঠিটা করোনারের আদালতই পড়ে শোনাবে। একই ধারার ভাষা–সেই নির্দিষ্ট অভিযোগ তা হল দ্বিতীয় ছেলেটি, মানে কলিন, সিমিংটনের সন্তানই নয়।

-তা কি সত্যি হতে পারে বলে মনে হয়?

–সে সিদ্ধান্তে আসার তো কোনো উপায় নেই। আমি এখানে পাঁচ বছর এসেছি। যতদূর জানি সিমিংটন দম্পতি শান্ত সুখী দম্পতিই ছিল। তবে এটা সত্যি যে ছেলেটার বাপ-মায়ের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না। কিন্তু এরকম তো অনেক শিশুই আছে, যারা ঠাকুরদা বা দাদামশাইদের মতো দেখতে।

–চেহারার অমিলই পত্রলেখককে অভিযোগ আর প্ররোচনা জুগিয়েছিল। আমি বললাম।

-খুবই সম্ভব। স্রেফ লাগামছাড়া প্রতিহিংসা। কিন্তু বেশ জুতসই জায়গাতেই ঘা মেরেছে, তা নাহলে আত্মহত্যার আর কোনো কারণ ছিল বলুন? জোয়ানা বলল।

গ্রিফিথ বলল, বেশ কিছুদিন ধরে মিসেস সিমিংটন অসুস্থ ছিলেন। মানসিক রোগ, হিস্টিরিয়ার মতো। আমিই ওঁর স্নায়ুর চিকিৎসা করেছি। আমার মনে হয়, তার নিজের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে তিনি অস্বীকার করলেও তার স্বামী তাকে বিশ্বাস করবেন না। সব মিলিয়ে লজ্জা ঘেন্নায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন।

গ্রিফিথ ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

সামনের দরজা খোলাই ছিল। আমরা ঢুকলাম।

মিঃ সিমিংটন জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসে আছেন, চোখে উদ্ভ্রান্তের দৃষ্টি।

মিস এলসি হল্যান্ডের গলা পাওয়া গেল।

-না, মিঃ সিমিংটন আপনাকে কিছু খেতেই হবে। সকালে কিছুই খাননি, রাতেও কিছু মুখে তোলেননি। ডাক্তার বলে গেছেন, শরীরে জোর রাখা দরকার আপনার।

সিমিংটন নিস্তেজ গলায় বলেন, মিস হল্যান্ড, তোমার মনে এত দয়ামায়া...

মিস হল্যাণ্ড তাকে জোর করে গরম এককাপ চা ধরিয়ে দিলেন। সিমিংটন বললেন, তুমি যা করছে, তাতে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না, তোমার তুলনা হয় না।

হল্যাণ্ড লজ্জায় লাল হয়ে বলল, যতোটা করতে পারি, তাতে আপনার সম্মতি থাকলেই আমি খুশী। বাচ্চাদের নিয়ে বা চিঠি লেখা, টেলিফোন ধরা নিয়ে চিন্তা করবেন না।

মিঃ সিমিংটন ফের বললেন বড়ো স্নেহময়তা তোমার।

ঘুরে দাঁড়াতেই হল্যান্ডের আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়ল। চাপা গলায় বলল, কি ভয়ানক কথা বলুন তো?

আমি দেখলাম ওর সুন্দর নীল চোখের কিনারায় গোলাপী ছোঁয়া, যেটা জানিয়ে দিচ্ছে তার মনিবগিন্নির মৃত্যুতে সেও চোখের জল ফেলেছে।

জোয়ানা বলল, মিঃ সিমিংটনকে বিরক্ত করতে চাই না, তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারি।

হল্যাণ্ড আমাদের অন্যদিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, হ্যাঁ, ওঁর পক্ষে তো একটা ভীষণ রকম আঘাত। কিছুকাল হল গিন্নিমা অদ্ভুত ধরনের ব্যবহার করছিলেন। ভয়ঙ্কর রকমের ছটফটানি আর কান্নাকাটির ঝোঁক, ডাক্তার গ্রিফিথ বলতেন, তার শরীরে কোনো গলদ নেই।

জোয়ানা বলল, আসলে আমরা এটুকু জানতে এসেছি যে, মেগানকে আমাদের সঙ্গে দু-একদিন রাখতে পারি কিনা অর্থাৎ সে যদি আসতে চায়।

একটু অনিশ্চিত সুরে হল্যাণ্ড বলল, মেগান? মানে আপনারা তো ঠিকই ভেবেছেন, তবে কে জানে, সে তো কেমন অদ্ভুত গোছের মেয়ে–এসব ব্যাপারে কী বলবে কে জানে। সে বোধহয় এখন ওপরতলায় পুরানো নার্সারিতে আছে। সবার থেকে দূরে থাকতে চায়।

জোয়ানার ইশারাতে আমি চট করে বেরিয়ে ওপরতলার চিলের ছাদে পুরানো নার্সারিতে গিয়ে দেখলাম একটা আবছা আলোআঁধারিতে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটা ডিভানে গুটি মেরে বসে আছে মেগান।

আমি ওকে নানা কথা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালাম আমাদের সঙ্গে যেতে। তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসতে বলে আমি নিচের তলায় ওদের এসে বললাম, মেগান আসছে।

এলসি বিস্মিত হয়ে বলল, আঁ, তবে ভালোই হলো। একটু কোটর ছেড়ে বেরুতে পারবে। এতসব কাজের মধ্যে ওর ঝুটঝামেলা না থাকলে আমিও মহা স্বস্তি পাবো। মিস বার্টন, বড়ো দয়ার কাজ করলেন, যা হোক। ওরে বাবা! টেলিফোন–বলে হল্যান্ড কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মেগান সুটকেস নিয়ে নেমে এল। তাকে গাড়িতে তুলে আমরা সোজা লিটল ফার্জে এলাম।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে স্যুটকেস রেখে মেগান একটা চেয়ারে বসেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। যাকে বলে হাউ-মাউ কান্না। একটু কাদার পর ভারী গলায় বলল, আমি এরকম কাণ্ড করে ফেললাম বলে কিছু মনে করবেন না।

জোয়ানা বলল, না, তাতে কী হয়েছে। এই নাও আরেকখানা রুমাল। আমি মেগানের হাতে একটা ভরা পানীয়র গ্লাস তুলে দিলাম।

–কী এটা?

–ককটেল, আমি বললাম।

–ককটেল? আগে কখনো আমি ককটেল খাইনি।

মেগান এক ঢোকে সবটাই খেয়ে ফেলল।

মেগান এবার জোয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এখানে এসে কান্নাকাটি করে নিজেকে কি বিদঘুঁটে করে তুলেছিলাম, এখন ভাবলেই অস্বস্তি হচ্ছে। আপনারা যে নিজের থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

–কৃতজ্ঞতা জানিও না ভাই, লজ্জা পাবো। আসলে জেরী আর আমার সব কথাবার্তাই ফুরিয়ে গেছে, আর কোনো কথাই খুঁজে পাই না আমরা।

আমি বলি, এবার আমরা গনেরিল রিগনি, ঐরকম নানা মজার্দার চরিত্র, শেক্সপীয়র নিয়ে অনেক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতে পারব।

-হুঁ, বুঝেছি, তোমরা সব ভারী ভারী উঁচু কথা বলবে। আমার তো শেক্সপীয়রকে ভীষণ রসকষ শূন্য মনে হয়।

আমি মেগানকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন বোধ করছো? মাথা ঘোরা নেই তো!

–বিলকুল ঠিকঠাক, ধন্যবাদ।

জোয়ানা মেগানকে নিয়ে ওপরতলায় চলে গেল। প্যারাট্রিজ মুখটা বেজার করে ভেতরে এসে বলল, লাঞ্চের জন্যে শুধু দু-কাপ কাস্টার্ড বানিয়েছিলাম, এখন তাহলে কী করা যাবে?

# ০৬.

তিনদিন পর বসল করোনার আদালত, দর্শকদের যথেষ্ট ভিড়ও হয়েছে। মহিলারা গালগল্পে মত্ত।

মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর সময়টা ধরে নেওয়া হল বেলা তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। তখন বাড়িতে তিনি ছিলেন একা। সিমিংটনের অফিসের পরিচারিকারা ছুটির দিন বলে বাইরে, এলসি হল্যান্ড বাচ্চাদুটোকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল, মেগান সাইকেলে চলে ঘুরতে যায়।

বিকেলের ডাকে চিঠিটা পেয়ে মিসেস সিমিংটন উত্তেজিতভাবে বাগানের চালাঘরে গিয়ে বোলতার বাসা নষ্ট করার পটাশিয়াম সায়ানাইড বিষ জলে গুলে খেয়ে ফেলেন। বিষ খাবার আগে শেষ বিক্ষুব্ধ কথাগুলো লিখে যান : আমি আর পারছি না।

আওয়েন গ্রিফিথ মিসেস সিমিংটনের ক্ষীণ স্নায়বিক সহ্যশক্তির ডাক্তারি সাক্ষ্য দিলেন। ভদ্র ও বিবেচক করোনার তীব্র ভাষায় বেনামী, শয়তানীভরা চিঠির লেখকের নিন্দা করে বলেন, ঐ চিঠিই এই খুনের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী। তিনি আশা করেন পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে বের করবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। জুরিরা রায় দিলেন, সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে আত্মহত্যা।

গ্রাম্য মহিলাদের ভিড় থেকে সেই একটা কথাই ফিসফিসানির সুরে শোনা গেল–আগুন না থাকলে ধোঁয়া হয় না।

.

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ন্যাসের আগমনের আগে স্থানীয় বাসিন্দারা আমরা সঙ্গে দেখা করে গেছে।

করোনার আদলতের পরদিন সকালে মিস গ্রিফিথ এসে হাজির।

সুপ্রভাত, শুনলাম মেগান হান্টারকে আপনারা এখানে এনেছেন?

–হ্যাঁ, এনেছি।

সে কথায় কথায় আমার কাছে প্রস্তাব রাখে যে, মেগানকে সে তার কাছে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাজকর্মে পোক্ত করে তুলবে। কিন্তু আমি তার প্রস্তাবে রাজী হইনি।

মিস গ্রিফিথ বলল, মিসেস সিমিংটন সম্বন্ধে কোনো কালেও আমার উঁচু ধারণা ছিল না, যদিও অবশ্য কখনো সন্দেহ করিনি আসল ব্যাপারটা।

ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করি, আসল ব্যাপার মানে?

মিস গ্রিফিথ বলে, এসব ব্যাপারে যে অমনিভাবে বেরিয়ে আসবে আদালতের মধ্যে। সিমিংটনের জন্যে ভীষণ দুঃখ হয় আমার।

–কিন্তু ওঁকে তো বলতে শুনেছেন? ঐ চিঠির মধ্যে একবিন্দুও সত্য ছিল না–এ সম্পর্কে উনি সুনিশ্চিত?

–স্ত্রীর সপক্ষে যে, কোনো পুরুষকেই দাঁড়াতে হয়। তাই অমন কথা বলেছেন। আমি ডিক সিমিংটনকে বহুকাল ধরেই চিনি। উনি প্রায়ই এসে থাকতেন আমাদের আগের উত্তরে এলাকার দেশে। আমি ডিককে ভালোমতোই চিনি। খুব অহংকারী, চাপা স্বভাবের মানুষ।

ইচ্ছা করেই বলি, তাতেই তো বোঝা যায় মিসেস সিমিংটন কেন তাকে চিঠিটা দেখাতে বা ওটার কথা বলতে ভয় পান? তিনি শঙ্কিত ছিলেন অস্বীকার করলেও হয়তো তার স্বামী বিশ্বাস করবেন না।

-হে ভগবান, আপনি কি তাহলে ভাবেন একটা মিথ্যা অভিযোগের স্বীকার হয়ে মহিলা একগাদা পটাশিয়াম সায়ানাইড গিলে বসবে?

করোনার এবং আপনার ভাইও সেটাই ভেবেছেন।

-পুরুষরা সব সমান। কিন্তু আপনি আমাকে ওসব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করাতে পারবেন না। কোনো নির্দোষ মহিলা বেনামী চিঠি হেসেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমিও তাই...বলে থেমে গিয়ে আবার বলল, করতাম।

আমি কিন্তু ওর কথার ছেদটা লক্ষ্য করলাম। আমি প্রায় নিশ্চিত যে সে আসলে আমিও তাই করেছি-বলতে গিয়েও থেমে গেল।

শত্রুর শিবিরেই লড়াইটা নিয়ে যেতে চাই আমি। মিঠে সুরে বলি, তাহলে আপনিও একখানা চিঠি পেয়েছেন?

এক মিনিট সবুর করে মুখ রাঙা করে বলল, হ্যাঁ পেয়েছিলাম। কয়েকটা শব্দ পড়েই বুঝলাম পাগলের প্রলাপ। সঙ্গে সঙ্গে সিধে ছুঁড়ে দিলাম বাজে কাগজের ঝুড়িতে। এসব নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, তত শীঘ্রই মিটে যায়।

আমি মিস গ্রিফিথকে জিজ্ঞেস করলাম, মেগানের টাকাকড়ির বিষয়ে কিছু ধারণা আছে আপনার? এ বিষয়ে আমার অহেতুক কোনো কৌতূহল নেই। কিন্তু ভাবছিলাম, ওর নিজের উপার্জন করার দরকার আছে কিনা।

–মনে হয় না সেটার খুব জরুরী প্রয়োজন আছে। ওর ঠাকুমা সামান্য কিছু আয়ের টাকা রেখে গিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়। ডিক সিমিংটন ওর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন ঠিকই, কিন্তু কথা সেটা নয়, কথা হল নীতির।

–কি নীতি?

-কাজ, মিঃ বার্টন, কাজ। কাজের মতো কিছুই নেই। সে পুরুষই হোক বা মেয়েরা। অলসতাই একমাত্র ক্ষমতার অযোগ্য পাপ।

-দেখুন স্যার এডোয়ার্ড গ্রে-কে তাঁর দুরারোগ্য আলসেমির জন্যে অক্সফোর্ড থেকে তাড়ানো হয়েছিল, পরে তিনি আমাদের বিদেশমন্ত্রী হন। আর মিস গ্রিফিথ কখনো ভেবে দেখেছেন, জর্জ স্টিফেনসন যদি বিরক্ত হয়ে বয়স্কাউট ছেড়ে রান্নাঘরে বসে কেটলির ওপর ঢাকনাটার অদ্ভুত নাচ না দেখতেন, তবে কি আজ কোনো ভালো এক্সপ্রেস ট্রেন আপনি দেখতে পেতেন?

এইমি একথা শুনে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আমি বলে চললাম, আমার থিওরি বলে, যত বড় আবিষ্কার তার মূলে আছে অলসতা– স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতা বশেই হোক। মানুষে চিন্তা অন্যের চিন্তা ধার করেই পুষ্ট হবে, কিন্তু সে পুষ্টির অভাব ঘটলে তখন দায়ে পড়ে নিজে থেকে ভাবতে শুরু করে। আর তখনই সৃষ্টি হয় মৌলিক, অমূল্য ফল!

–মিঃ বার্টন, আপনার মনোভাব হল বেশির ভাগ পুরুষের মার্কামারা মনোভাব। আপনি চান, মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হোক। আমার ডাক্তারি পড়ার খুব

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার বাবা-মা ফি জমা দেবার কথা কানেই নিলেন না। কিন্তু ভাইয়ের বেলায় সঙ্গে সঙ্গেই ফি-এর টাকা জুটে গেল। হয়তো আমি ওর চেয়ে ভালো ডাক্তার হতে পারতাম।

–শুনে দুঃখ পেলাম মিস গ্রিফিথ।

-ওসব আমি এখন আর মনে রাখিনি! আমার প্রচুর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমি সর্বদাই কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। আমি একজন সুখী মানুষ। মেয়েদের কাজ করার বিভিন্ন প্রাঙ্গণ আছে। মেয়েদের স্থান সবসময় রান্নাঘরে, এই সাবেকি ধারণাকে আমি মনে-প্রাণে ঘেন্না করি।

-আমি যদি আপনাকে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে দুঃখিত। আসলে আমি বলতে চেয়েছি, মেগানকে ঘরোয়া কাজের ভূমিকায় দেখতে আমি একেবারেই চাই না।

-না, বেচারী মেয়েটার কোনো কাজের পক্ষেই যোগ্যতা নেই। ওর বাপটি বুঝলেন..বলে থেমে গেল এইমি।

আমি ভোতা গলায় জবাব দিলাম, ঠিক বুঝলাম না। প্রত্যেকেই দেখি ওর বাপটি-বলে থেমে যায়। কী করেছিলেন ভদ্রলোক? বেঁচে আছেন?

–ঠিক জানি না। তবে খুবই খারাপ লোক ছিলো নিশ্চয়ই। আমার বিশ্বাস, জেল খাটা এবং মাথার গণ্ডগোলও ভালোরকম ছিল। মেগানের মধ্যেও তার প্রভাব রয়েছে।

নিজের বোধজ্ঞানের ওপর ওর যথেষ্ট দখল আছে। আমি ওকে বুদ্ধিমতী মেয়েই মনে করি। জোয়ানারও ওকে পছন্দ।

–আমরা সকলেই ভেবে আবাক হই, কী করে এই অজপাড়াগাঁয়ে আপনারা ডুব মেরে রয়েছেন?

–ডাক্তারের হুকুম। শান্ত পরিবেশই আমার একমাত্র দাওয়াই। এখন দেখছি লিমস্টকের ক্ষেত্রে অবশ্য সে কথা ততটা খাটে না।

-না না, তা বটে। এইমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শোনাল, বুঝলেন...এসব কাণ্ডকারখানা যেমন করেই হোক বন্ধ করতে হবে।

-পুলিশ কি কিছু করছে না?

-সেরকমই তো ধারণা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে। আমাদের বোধহয় ওদের চেয়েও বেশি কাণ্ডজ্ঞান আর বুদ্ধি আছে! যেটা দরকার, সেটা হলো স্থির সংকল্প।

হঠাৎই বিদায় নিল এইমি।

.

সেদিন বিকেলে শহরে সিমিংটনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তাকে জানালাম, আর কটা দিন মেগান আমাদের সঙ্গে থাকলে আপনার আপত্তি নেই তো?

-ওঃ...ইয়ে...মেগান? ও হা হা, ভালোই বলেছেন আপনি।

সেইসময় থেকে সিমিংটনের ওপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। এত সহজে নিশ্চিন্তে উনি মেগানকে মন থেকে বিদায় দিয়েছেন? উনি সরাসরি ঘৃণা করতে পারতেন মেগানকে কিন্তু নিজের সৎ মেয়ের প্রতি তার ঘোর উদাসীনতা আমায় বিরক্ত করল।

বললাম, ওর সম্পর্কে ভেবে রেখেছেন কিছু?

-মেগানের ব্যাপারে? যেন চমকে উঠলেন, সে তো মানে আগের মতোই আমার বাড়িতে থাকবে।

আমি একথা শোনার পর ওখানে আর বসতে পারিনি।

.

সেদিন সবে চায়ের টেবিলটা সাফ হতেই এলেন এমিলি বারটন। দুজনে প্রায় আধঘণ্টা কথা হোল। তারপর দুজনে বাড়ির দিকে এগোলাম।

হঠাৎই গলার আওয়াজ খাটো করে বললেন, আশা করি মেয়েটা...তেমন হয়তো মুষড়ে পড়েনি, এইসব ভয়ানক কাণ্ডের পর?

-আপনি ওর মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন?

–হ্যাঁ, সে তো বটেই। ব্যাপারটার পেছনে কোনো অপ্রীতিকর...

মিস বারটনের মনের প্রতিক্রিয়াটা জানার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠি।

প্রশ্ন করি, আপনার কি মনে হয়? সত্যি সেরকম কিছু?

-না, না, না–নিশ্চয়ই নয়। আমার দৃঢ় ধারণা মিসেস সিমিংটন কখনোই...মানে ছেলেটা তা নয়। যদিও বলা চলে এ এক ধরনের বিচার।

–বিচার? অবাক চোখে তাকাই তার দিকে।

–এইসব ভয়ানক চিঠি আর তার ফলে এই দুঃখ-যাতনা যেন বিশেষ উদ্দেশ্য করেই পাঠানো–আমি ভেবে পাই না।

–উদ্দেশ্য করে পাঠানো তো বটেই–গম্ভীরভাবে বলি।

-না, না, মিঃ বার্টন, আপনি কথাটা ধরতেই পারলেন না। বলছি এসবের পেছনে রয়েছে বিধাতার হাত।

–সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরেকটু সুপাচ্য দাওয়াই ব্যবহার করতে পারতেন নিশ্চয়ই?

মিস এমিলি নিচু গলায় বললেন, ঈশ্বরের পন্থা রহস্যময়।

-না, আমি জোর দিয়ে বললাম, মানুষ নিজের ইচ্ছায় যেসব দুষ্কর্ম করে, তার জন্যে ঈশ্বরকে দায়ী করে। আমি মনে করি এরজন্যে শয়তানকে দায়ী করা উচিত।

–আমি এটা বুঝি না, কেন এমনতরো ইচ্ছে একজনের জাগবে?

–বিকৃত মানসিকতা, আমি বলি।

–বড়োই করুণ মনে হয়।

–আমার করুণ মনে হয় না, আমি এদের অভিশাপ দিই।

–কিন্তু মিঃ বার্টন কেন? এ থেকে কী মজা পেতে পারে একজন?

–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এ আপনার আর আমার বোঝার বাইরে।

গলার স্বর নিচু করে বললেন এমিলি, ওরা সবাই মিসেস ফ্লীটের কথা বলে, আমার তো বিশ্বাসই হয় না। এধরনের ঘটনা আমার জ্ঞানতঃ কখনো ঘটেনি। এমন চমৎকার একটা সমাজ ছিল এখানে। আমার মা বেঁচে থাকলে কী বলতেন? ঈশ্বরের মহিমা যে তিনি রেহাই পেয়ে গেছেন।

মনে মনে ভাবি, বুড়ি বারটনের সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় এই উত্তেজক পরিস্থিতি তিনি যথেষ্ট তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন।

এমিলি বলে চলেছেন, আমি তো ভীষণ কাতর হয়ে পড়ি।

আমি সাহসভরে জিজ্ঞাসা করে ফেলি, আপনি..মানে...নিজে এ ধরনের কিছু পাননি?

উনি লাল হয়ে গেলেন, না, না, না, উঃ, সে তো ভয়ানক কথা হত।

আমি তাড়াতাড়ি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তিনি বেশ বিচলিত মুখেই প্রস্থান করলেন।

–আমি বাড়ির ভেতরে এলাম। জোয়ান ড্রয়িংরুমে চুল্লিতে সবে আগুনটা দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওর হাতে একটা খোলা চিঠি।

আমি ঢুকতেই জোয়ানা বলল, জেরি। চিঠির বাক্সে এটা পেলাম। কেউ হাতে দিয়ে গেছে। শুরুর সম্বোধনে বলা হয়েছে, ওহে রং মাখা ঘর-মজানি...।

-আর কি লিখেছে?

–ঐ একই আবর্জনা-বলে ও চিঠিটা আগুনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি চট করে আগুন ধরার আগেই চিঠিটা তুলে নিলাম।

বললাম, এটা দরকার হতে পারে পুলিশের জন্যে।

পরদিন সকালে আমার কাছে এলেন পুলিশের সুপারিটেন্ডেন্ট ন্যাস। লম্বা, সৈনিকসুলভ, শান্ত চিন্তামগ্ন চোখদুটো–যাকে বলে সেরা জগতের সি. আই. ডি. জেলা সুপার।

সুপ্রভাত মিঃ বার্টন। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন আমি কী ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি।

-হ্যাঁ, ঐ চিঠির ব্যাপার তো!

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। শুনলাম আপনিও একখানা চিঠি পেয়েছিলেন, চিঠির কথাগুলো আপনার মনে আছে?

একমিনিট ভেবে চিঠির কথাগুলো যথাসম্ভব মনে করে সাজিয়ে বললাম।

-বুঝলাম, ন্যাস বললেন, চিঠিটা রাখেননি মিঃ বার্টন?

-না, ভেবেছিলাম নতুন এসেছি বলে কেউ বিদ্বেষ বশে একাজ করেছে, নেহাৎই বিচ্ছিন্ন একটা ব্যাপার তবে আমার বোন গতকাল একটা চিঠি পেয়েছিল, সেটা আছে।

আমি দেরাজের তালা খুলে ন্যাসকে চিঠিটা দিলাম। ন্যাস পুরোটা পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি আগের খামের মতোই?

-যতটা স্মরণ করতে পারি, তাই মনে হয়।

চিঠির বয়ানে আর খামের ওপর একটা রকম তারতম্য?

-হ্যাঁ, খামটা ছিল টাইপ করা, আর চিঠিটা শুধু একটা কাগজের ওপর সাঁটা ছাপা অক্ষর।

ন্যাস চিঠিখানা পকেটে পুরে বললেন, মিঃ বার্টন, আপনাকে একটু আমার সঙ্গে থানায় আসতে হবে। কিছু শলা-পরামর্শের ফলে আমরা সময়ের অপব্যয় বাঁচাতে পারবো।

গাড়িতে উঠলাম। ন্যাস জানালেন যে, ব্যাপারটার গোড়া অবধি পৌঁছবেন বলে তাদের আশা। তার জন্যে ডাকঘরের ওপর নজর, টাইপরাইটার পরীক্ষা, আঙুলের ছাপ এগুলো তদন্ত করে দেখতে হবে।

পুলিশ থানায় পৌঁছে দেখি সিমিংটন আর গ্রিফিথ আগেই সেখানে হাজির। একজন দীর্ঘকায়, চৌকোমুখো সাধারণ পোশাকের ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ইনসপেক্টর গ্রেভস। ইনি লন্ডন থেকে এসেছেন। বেনামী চিঠিপত্রের ব্যাপারে উনি একজন বিশেষজ্ঞ।

-এই কেসগুলো সবই এক ধরনের, গম্ভীর গলায় বললেন গ্রেভস, শুনলে অবাক হবেন না, শব্দ চয়ন আর বক্তব্য প্রায় বহুবহু একরকম।

গ্রেভস কয়েকটা চিঠি টেবিলে ছড়িয়ে দেখছিলেন। তিনি জানালেন, কাজ শুরু করার মতো অনেকগুলো চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। ভদ্রমহোদয়গণ; আমি অনুরোধ করব, চিঠি যদি আরো কেউ পান সঙ্গে সঙ্গে এখানে নিয়ে আসবেন। যদি অন্য কেউ চিঠি

পেয়েছে বলে জানতে পারেন, তাহলে চেষ্টা করবেন তাদের এখানে আনতে। আমার হাতে এখন মিঃ সিমিংটনকে লেখা চিঠি, মিস গিঞ্চকে পাঠানো, মিসেস মাজকে, আরেকটা থ্রি-কাউন্স-এর বার-পরিচারিকা জেনিফার ক্লার্কের নামে। এছাড়া মিসেস সিমিংটন এবং মিঃ বার্টনের চিঠিও আছে। এর মধ্যে একটিও নেই যার জুড়ি আমার পুরনো কেসগুলোর মধ্যে পাইনি। সেই একঘেয়ে বাঁধা বুলি...।

সিমিংটন বললেন, লেখক কে হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট মতে পৌঁছতে পেরেছেন?

গলা খাঁকারি দিয়ে সাফ করে গ্রেভস ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা শুরু করলেন : কতকগুলো নির্দিষ্ট মিল সব চিঠিগুলোতেই আছে। যেমন–একটা ছাপা বইয়ের পাতা কেটে কেটে অক্ষর সাজানো হয়েছে। পুরানো বই, আমার হিসেবে ১৮৩০ সালের কাছাকাছি ছাপা। পত্রলেখক তার হাতের লেখা লুকোবার জন্যেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। হাতের ছাপ লুকোবার জন্যে সে গ্লাভস ব্যবহার করেছে। এছাড়া চিঠি বা খামগুলোর ওপর ডাক বিভাগের লোকেরা নাড়াচাড়া করার পরও আবার প্রকল্পের এবং আরো অনেকের এলোমেলো আঙুলের ছাপ, কিন্তু সবগুলোতে বিশেষ একটা সাধারণ ছাপ-এর অভাব। খামগুলো টাইপ করা হয়েছে ৭ নম্বর উইগুসর মেশিনে, যা যথেষ্ট ব্যবহৃত এবং পুরানো। ওতে এ আর টি আবার দুটো বেঁকে গেছে। বেশির ভাগ চিঠিই স্থানীয় ডাকে বা হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটার উৎপত্তিস্থল একান্তই স্থানীয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পত্রগুলো লিখেছে কোনো মহিলা এবং তিনি অবিবাহিতা এবং বয়স্কা।

আমি বলি, তাহলে আপনাদের প্রধান সূত্র ঐ টাইপ মেশিনটা? তাহলে তো এই ছোটো জায়গায় বেশি মুশকিল হবার কথা নয়।

ন্যাস বললেন, দুর্ভাগ্যক্রমে টাইপরাটারটা বড়োই সহজলভ্য। মিঃ সিমিংটনের অফিসের একটা পুরানো মেশিন মহিলাদের ইনস্টিটিউটে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সকলেরই অবাধ প্রবেশ।

–বিশেষ স্পর্শ বৈশিষ্ট্য...নাকি ওইরকম তো বলেন আপনারা–এসব দেখে কিছু বলতে পারেন?

গ্রেভস বললেন, এই খামগুলো টাইপ করা হয় একটা মাত্র আঙুল ব্যবহার করে। সে যে অনভ্যস্ত তা নয়, সে এটা করেছে আমাদের বুঝতে দিতে চায় না বলে। মহিলাটি বেশ ধূর্তই। তবে নিশ্চয়ই কোনো গেঁয়ো মহিলা নন। এখানে তো বেশিরভাগই নিরক্ষর, শব্দ বানান করতে পারে না।

আমি ভাবতে লাগলাম মিসেস ক্লিট বা তার মতো কোনো মহিলার কথা।

সিমিংটন আমার চিন্তাটাকে কথায় প্রকাশ করলেন, তিনি জোর দিয়ে বললেন, এ জায়গাটায় তো আধডজন থেকে একডজন এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে। করোনার আদালতে আমি যা বলেছিলাম আমি আজও তাই বলতে চাই। নিছক স্ত্রীর মর্যাদা

রাখতেই ঐ বক্তব্য পেশ আমি করিনি। আমি জানি এটা মিথ্যা। আমার স্ত্রী ছিলেন স্পর্শকাতর স্বভাবের.আর ইয়ে ব্যাপারে যাকে বলে নীতিবাগীশ। এ ধরনের কোনো চিঠি তার পক্ষে রীতিমতো আঘাত। এছাড়া তার স্বাস্থ্যও ছিল দুর্বল।

সিমিংটন কাঁপতে লাগলেন, বললেন, আশাকরি খুব শিগগিরই আপনারা ঐ পত্রলেখিকা খুনীকে খুঁজে বার করতে পারবেন। একটু থেমে বললেন, এখন সে নিজে কি ভাবছে কে জানে -বলে সিমিংটন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

গ্রেভস বললেন, এই বেনামী চিঠি ছাড়ার পর অভ্যাসটা প্রেরক ছাড়তে পারবে না। বারবার করতে থাকবে। সবসময় তাই করে।

শিউরে উঠে আমি দাঁড়িয়ে ওদের জিজ্ঞেস করি, আমাকে আর তাঁদের প্রয়োজন আছে কিনা। এই উৎকট আবহাওয়া থেকে আমি বাইরে খোলা বাতাসে যেতে চাই। তারা আমাকে রেহাই দিলেন এবং বললেন, কেউ কোনো চিঠি পেলেই যেন পুলিশকে তা রিপোর্ট করে একথা লোককে জানাবেন।

গ্রেভস জিজ্ঞেস করলেন, এমন কাউকে জানেন কি মিঃ বার্টন, যিনি আপনার ধারণায় কোনো বেনামী চিঠি পাননি।

আমি ইতস্তত করে এমিলি বারটনের সঙ্গে আমার কথাবার্তার এবং তিনি ঠিক যা যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলাম। গ্রেভস জানালেন, এটা হয়তো পরে কাজে লাগবে, আমি নোট করে রাখব।

আমি গ্রিফিথের সঙ্গে বিকেলের রোদের মধ্যে বেরিয়ে এলাম।

আমি বললাম, বলো তো গ্রিফিথ, পুলিশ কি কিছু জানে? কোনো ধারণা ওদের মাথায় আছে?

–ঠিক জানি না। তবে ওরা আসল ব্যাপার ফাস করে না। ওদের আশ্চর্য কলাকৌশল আছে। দুজনে হাইস্ট্রিট ধরে হাঁটছি। বাড়ির দালালদের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, আমার বাড়িভাড়ার দ্বিতীয় কিস্তি আগাম দেবার সময় হয়ে গেছে। কেবল মনে হচ্ছে টাকাটা মিটিয়ে এখান থেকে জোয়ানাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। তবে আমি যাব না। কারণ ইতর কৌতূহলের জোর মনের দুর্বলতাকে ছাড়িয়ে যায়। শেষপর্যন্ত কী হয় সেটাই দেখার।

আমি দালাল অফিসের দরজা ঠেলে ঢুকলাম। যে মহিলাটি টাইপ করছিল তাকে আমার চেনা চেনা লাগছিল। দু-এক মিনিট চিন্তা করার পর মনে পড়ল উনি সিমিংটনের অফিসের মিস গিঞ্চ। আমি সে কথাটা বলেই ফেলি, আপনি তো গ্যালব্রেথ এ্যান্ড সিমিংটনে ছিলেন, তাই না?

-হ্যাঁ, তাই তো। এখানে আমার ভালো পদ, মাইনে যদিও অততটা নয়। তবে কিছু জিনিস আছে যার মূল্য টাকার চেয়ে বেশি, তাই মনে হয় না আপনার?

–নিঃসন্দেহে, আমি বললাম।

মিস গিঞ্চ এরপর ফিসফিস করে বলল, ঐ বিচ্ছিরি চিঠিগুলো। আমি পেয়েছিলাম ভয়ানক একখানা...আমাকে আর মিঃ সিমিংটনকে জড়িয়ে। আমি সোজা পুলিশকে জমা দিলাম। এরপরেও দেখলাম লোকে আমাদের নিয়ে গালগল্প করছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমার উচিত মন্দ পরিবেশ ত্যাগ করা, যদিও মিঃ সিমিংটন আর আমার মধ্যে কখনোই খারাপ কিছু ছিল না।

-না না, তা তো ছিল না। আমি বিব্রত হয়ে বলি।

–কিন্তু লোকের মন তো মন্দ। হায়, কী মন্দই যে তাদের মন!

বিচলিতভাবে তার চোখের দৃষ্টি এড়াতে চাইলেও আমার নজর পড়ে গেল সেদিকেই, আর একটা অত্যন্ত অস্বস্তিজনক ব্যাপার আবিষ্কার করে বসলাম।

মিস গিঞ্চ ব্যাপারটা পুরোপুরি উপভোগ করছে। আজ এখানে আসার আগেই একবার এমন লোককে দেখেছি বেনামী চিঠিতে আনন্দের পরিচয় পেয়েছেন, তবে সেটা তার পেশাগত। মিস গিঞ্চের আনন্দটা দেখছি নেহাত্র ইঙ্গিতময় অর বিতৃষ্ণাজনক।

আমার চমক-খাওয়া মনে একটা কল্পনা ঝিলিক মেরে যায়।

মিস গিঞ্চ নিজেই কি এইসব চিঠি লিখেছিল?

.

# ০৭.

বাড়ি ফিরে এসে দেখি মিসেস ডেন কলপ জোয়ানার সঙ্গে গল্প করছেন। তাকে কেমন যেন বুড়োটে আর অসুস্থ দেখাচ্ছে। বললেন, আমার কাছে এটা ভীষণ আঘাত মিঃ বার্টন। বেচারী... বেচারী।

বললাম, হ্যাঁ, কাউকে বাধ্য হয়ে জীবন শেষ করতে দেখলে প্রচণ্ড দুঃখ হয় বৈকি।

–আপনি কি মিসেস্ সিমিংটনের কথা বলছেন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আপনিও তো তাই বলছিলেন?

–হা, ওঁর জন্যে দুঃখ তো হয়ই, তবে ঐ ব্যাপারটা একদিন না একদিন তো ঘটতই।

–তাই নাকি? ঘটত নাকি? জোয়ানা বলল।

মিসেস কলপ বললেন, হ্যাঁ, বাছা, তাই-ই মনে হয়। আত্মহত্যাই যদি বিড়ম্বনার থেকে মুক্তি বলে মনে করো, তাহলে যাহোক কিছু বিড়ম্বনাতেই সেটা করা সম্ভব। যেকোনো রকমের বিশ্রী আঘাতের মুখোমুখি হলেই তিনি এ কাজ করতেন। উনি ঐ ধরনেরই মহিলা ছিলেন।

–কিন্তু একটু আগে আপনি বেচারী কাকে বোঝাচ্ছিলেন?

–যে ঐ চিঠিগুলো লিখেছিল সেই মহিলার কথা বলছি।

–মাপ করবেন। তার জন্যে সমবেদনা জানিয়ে বাজে শব্দ খরচ করা আমার পোষাবে না।

–কিন্তু আপনি কি মনে করেন না আপনার অনুভূতি নেই? কল্পনাশক্তি নিয়ে ভাবুন, কি প্রচণ্ড মরিয়া, অসুখী মন নিয়ে কেউ এ ধরনের চিঠি লিখতে পারে। সে সমাজ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন। আমি দুঃখ পাই এই শহরে এমন ভয়ঙ্কর অসুখী একজনের আমি খবর রাখি না। বেচারী হতভাগী!

তিনি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমার একমত হবার মতো মন ছিল না। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি, মিসেস কলপ, এই মহিলা কে সে সম্বন্ধে আপনার একটুও ধারণা নেই? ধন্দে পড়া দুটো চোখ আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আমার ভুল হতে পারে। তাই না?

দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার সময় মাথাটা ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, মিঃ বার্টন, আপনি এখনো বিয়ে করেননি কেন? আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কি প্রথমে উত্তর দেব ভেবে পাই না, তারপর বললাম, বোধহয় সঠিক মেয়েটির সাক্ষাৎ পাইনি, তাই।

মিসেস কলপ বললেন, জবাবটা খুব ভালো হলো না, কারণ কতো মানুষই তো দেখেশুনেও ভুল মেয়ে বেছে নেয়। এবার উনি সত্যিই বিদায় নিলেন।

.

পরদিন সকালে আমি আর জোয়ানা একটু দেরি করে ব্রেকফাস্ট করছি।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি এইমি গ্রিফিথ মেগানের সঙ্গে কথা বলছে।

আমাদের দেখে হাসিমুখে বলল, হ্যালো কুঁড়ের বাদশারা, আমি তো উঠেছি কোন ভোরে। এই মিস মেগানকে একটু জিজ্ঞেস করছিলাম আমাদের রেডক্রশ স্টলটার জন্যে কিছু শাকসজী দান করতে পারবে কিনা। যদি হয়, তাহলে আওয়েনকে বলে দেব গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে।

হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। আমি এইমির কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে ভেতরে গেলাম টেলিফোনটা ধরতে। কথা বলে জানলাম কোনো এক অ্যাগনেস ওয়াডল, প্যারট্রিজকে চাইছে।

আমি প্যারট্রিজকে জানালাম। সে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে, ঝাড়ুটা ফেলে খরখর করে নিচে নেমে গেল। আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম।

প্যারট্রিজ টেলিফোনে কথা বলার শেষে জোয়ানাকে গম্ভীর গলায় বলল, মিস, টেলিফোনে কথা বলার জন্যে আমি মাফ চাইছি। কর্তাকে ফোন করতে হল, আমাকে ডাকতে হল, এসমস্ত ঝামেলার জন্যে আমি দুঃখিত।

জোয়ানা বলল, আরে তাতে কী হয়েছে!

প্যারট্রিজের মুখখানা আরো গোমড়া হয়ে গেল। বলল, এই বছর ষোলোর অ্যাগনেস মেয়েটা অনাথ আশ্রম থেকে সোজা এখানে আসছে। তাকে পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। কিছু একটা ব্যাপারে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাই বলছিলাম, আজ বিকেলে ওকে রান্নাঘরে চা খেতে বলতে পারি?

জোয়ানা হতভম্বের মতো বলল, তাতে কি? সবার সঙ্গে চা খেতে বলায় তোমার অসুবিধে কোথায়?

হঠাই প্যারট্রিজ আরো কঠিন হয়ে জবাব দেয়, বুড়ি মা-ঠাকরুণ এবং মিস এমিলি কখনোই বাইরের লোককে রান্নাঘরে ঢুকতে দেননি।

জোয়ানা প্যারট্রিজের সঙ্গে ঠিক তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে না। প্যারট্রিজ চলে যেতে জোয়ানা বলল, বুঝতে পারি না বেশিরভাগ লোক আমাকে পছন্দ করলেও প্যারট্রিজের আমাকে ভালো লাগে না কেন?

আমি বলি, হয়তো জবরদস্ত গৃহকর্ত্রী নস বলে ওর অপছন্দ।

কয়েক মিনিট আগে মেগান বাগানের দিকে গিয়েছিল। এখন সে বাগানের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে। আমি যেতেই আচমকা বলল, ভাবছি আজই আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

ওর এই কথায় আমি উত্তেজিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠি। তখন আমি আর জোয়ানা অনেক বুঝিয়েও তার মন বদলাতে পারলাম না। অগত্যা জোয়ানা তাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে।

.

স্বীকার করতে আপত্তি নেই, মেগান যেভাবে হট করে চলে গেল, ওতে আমি বেশ খানিকটা চমকে গেছি।

ঠিক দুপুরের খাওয়ার আগে আওয়েন গ্রিফিথ এল গাড়ি নিয়ে। আমিও একটু ড্রিঙ্ক দেব বলে শেরী আনতে ভেতরে গেছি, দেখি, জোয়ানা তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

আওয়েনকে সে নানান প্রশ্ন, যেমন, সরকারী ডাক্তারের চাকরি তার পছন্দ কিনা, এবং এর চেয়ে স্পেশালিস্ট হলে আরো ভালো হত কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর গ্রিফিথও তার

তিন নম্বর শেরীর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নানা শারীরিক জটিল প্রতিক্রিয়া সংজ্ঞার বক্তব্য বকে চলেছে।

জোয়ানাকে বেশ গভীর উৎসাহীর মতো দেখাচ্ছে। আমার মনে হল, জোয়ানার গ্রিফিথের মতো ভালোমানুষকে নিয়ে এমন টানাটানি ঠিক কাজ হচ্ছে না।

এরপর জোয়ানা তাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করায় গ্রিফিথ জানালো, তার বোন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। জোয়ানা তখন ফোন করে এইমি গ্রিফিথকে জানিয়ে দিল। অতএব গ্রিফিথ লাঞ্চের জন্যে রয়েই গেল। মনে হল সে বেশ আমোদই পাচ্ছে।

.

সেদিন এমিলির বাড়িতে আমরা চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। একটি রোগা, ঢ্যাঙা স্ত্রীলোক আমাদের দরজা খুলে জানালো মিস বারটন এখন নেই, আমরা যেন অপেক্ষা করি। বোঝাই যাচ্ছে, এই হল বিশ্বাসিনী ফ্লোরেন্স। তার পিছু পিছু উপরের কামরায় গিয়ে বসলাম। আসবাবের বাড়াবাড়ি থাকলেও বেশ আরামদায়ক বসার ঘর।

ফ্লোরেন্স তিরস্কারের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, যতটা পারি ওনাকে আরামে রাখার চেষ্টা করি। ওনার তো নিজের বাড়িতেই সঠিকভাবে মাথা গুঁজে থাকা উচিত।

-তা, মিস বারটনই তো বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন।

–বাধ্য হয়েছিলেন। গভর্নমেন্ট তো তাকে ছেড়ে দেবে না। অঢেল টাকাপয়সা ছিল। শেয়ারে নাকি আগের মতো টাকা হয় না। কিন্তু তাই-বা কেন, শুনতে চাই? যিনি হিসেবপত্র বোঝেন না, তাকে পথে বসানো? যে যার নিজেরটা ঠিক বোঝে। আমি যদ্দিন থাকবো, এ জুলুম সহ্য করবো না। ওঁর চাই দেখাশোনা। মিস এমিলির জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজী।

এরপর ফ্লোরেন্স দরজা ভেজিয়ে গটগট করে চলে গেল।

কিছু পরে দরজা খুলে গেল। ঢুকলেন মিস এমিলি। কিছুটা হাঁপিয়ে, বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, আহা দেখুন তো! দেরি করে ফেললাম।

এই শহরে একটু কেনাকাটার ছিল। আপনাদের এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য খারাপ লাগছে। জোয়ানা বলল, আসলে আমরাই একটু আগে এসে পড়েছিলাম।

এমিলি বললেন, চায়ের মতো মেয়েলি খানাপিনায় আসতে চেয়েছেন এটাই কতো বড়ো কথা মিঃ বার্টন। মনে হয় এমিলির মনের আঁকা পুরুষটি হল–হুইস্কি সোডা আর চুরুট খেয়ে যাওয়া আর গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে সুযোগ বুঝে ফষ্টিনষ্টি।

ইতিমধ্যে আমাদের কেক, স্যান্ডউইচ, প্রচুর কেক দেওয়া হল, তার সঙ্গে চীনদেশের চা। অপূর্ব স্বাদ।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনায় ডাক্তার গ্রিফিথের প্রসঙ্গ এলো। মিস এমিলি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সিমিংটনের প্রসঙ্গ ওঠায় উনি বললেন, সিমিংটন চতুর আইনজ্ঞ, বারটনকে সাহায্য করেছিলেন ইনকাম ট্যাক্স থেকে কিছু টাকা বাঁচাতে। আর মিসেস সিমিংটনের উচিত ছিল মরার আগে তার ছেলেপুলের কথা চিন্তা করা।

কথাপ্রসঙ্গে এমিলি জানালেন, খবরের কাগজে দেশভ্রমণ সম্বন্ধে পড়ে তার খুবই বিদেশ ঘুরতে ইচ্ছে হয়।

জোয়ানা প্রশ্ন করল, তাহলে যান না কেন?

-না না, অসম্ভব। একলা কি যাওয়া যায়? খরচের ব্যাপারটা নয় বাদই দিলাম। একা ভ্রমণ করাটা বড়ো অদ্ভুত দেখাবে না। তাছাড়া বিদেশে বন্দরে নেমে ঐ লটবহর নিয়ে কিভাবে চলব, জানি না।

জোয়ানা এমিলির আশঙ্কাভরা মনটাকে শান্ত করার জন্যে উদ্যম উৎসবের কথা বলল। স্বাভাবিকভাবেই মিসেস ডেন কলপের দিকে কথাবার্তা মোড় নিল।

–বুঝলেন বন্ধুরা, উনি সত্যি এক অদ্ভুত ধরনের মহিলা। আমি আপনাদের ঠিক বোঝাতে পারব না, এমন সব আচমকা কথা বলেন না উনি...যেন আপনি সেখানে নেই, তার সামনে অন্য কেউ। তবে উনি খুব ভদ্রঘরের মেয়ে। তার স্বামীর খুব অনুরক্ত।

ভদ্রলোকও খুব জ্ঞানীগুণী, নিষ্ঠাবান মানুষ। তবে এখানকার গণ্ডিতে পড়ে থেকে সব অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

আরও কিছু কথাবার্তার পর আমরা বিদায় প্রার্থনা করলাম।

.

সেদিন রাতে খেতে বসে জোয়ানা প্যারট্রিজকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাগনেসকে নিয়ে তার চা পার্টি কেমন হল?

প্যারট্রিজ মুখ লাল করে জানালো যে, অ্যাগনেস কথা দিয়েও আসেনি। সে তত তাকে নেমতন্ন করে ডেকে পাঠায়নি। তার আজকের দিনটা ছুটি ছিল বলে কি প্রসঙ্গে পরামর্শ নিতে নিজের থেকে আসতে চেয়েছিল। তা এলো না। তবে দেখা হোক, প্যারট্রিজ জানালো, তার সঙ্গে দেখা হলে ঝাল ঝাড়বে তার ওপর। বলে রেগে টং হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

আমরা বেনামী চিঠিগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলাম।

জোয়ানা বলল, মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যার পর আজ ঠিক এক হপ্তা হলো। ন্যাস, গ্রেভস কতদূর কি এগোলেন কে জানে?

ঠিক এক হপ্তা–কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অস্বস্তি হতে লাগল। আমি কেমন আনমনা হয়ে পড়লাম। মন তখন টুকরো টুকরো ঘটনাকে জোড়া দিতে ব্যস্ত। আমি জোয়ানাকে অবাক করে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, পরিচারিকারা হপ্তায় একদিন ছুটি কাটাতে যায়, তাই না?

-হ্যাঁ, সেটাই তো বরাবরের নিয়ম।

আমি ঘড়িটার দিকে তাকাই। রাত সাড়ে দশটা। আমি সিমিংটনের বাড়িতে ডায়াল করলাম। অপর প্রান্তে মিস এলসি হল্যান্ডের কণ্ঠ ভেসে এলো।

বললাম, আমি জেরি বলছি, তোমাদের কাজের মেয়ে অ্যাগনেস ফিরেছে? এলসি আমাকে রিসিভার ধরতে বলে দেখতে চলে গেল।

দুমিনিট বাদে সে রিসিভার তুলে জানাল, না, অ্যাগনেস ফেরেনি।

তখনই বুঝলাম আমার আন্দাজটা ভুল নয়।

তারপরই সিমিংটনের গলা শুনতে পেলাম, হ্যালো বার্টন, ব্যাপার কি?

–আপনার কাজের মেয়ে এখনো ফেরেনি?

-না। কিন্তু ওর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? মেয়েটির কিছু ঘটেছে, সে রকম ধারণা করার মতো কিছু ঘটেছে নাকি?

গম্ভীর গলায় বললাম, হলে অবাক হবো না।

.

# ০৮.

রাতে ঘুমটা বড়ো বিচ্ছিরি হল। মনের মধ্যে সারা রাজ্যের ধাঁধার মতো টুকরো ছবিগুলো ঘুরতে লাগল।

আমি ছটফট করতে লাগলাম, কোথাও নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। তার নকশাটা যদি বুঝতে পারতাম। আমাকে জানতেই হবে ঐ হতচ্ছাড়া চিঠিগুলো কার লেখা। কোথাও একটা নিশ্চয়ই সূত্র আছে...

স্বপ্ন দেখি মিসেস কলপ একটা গ্রে-হাউন্ড হয়ে গেছেন আর আমি তাকে বগলেশ আর শেকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।

.

টেলিফোনের শব্দে লাফিয়ে উঠে পড়ি। সাড়ে সাতটা বাজে। রান্নাঘর থেকে প্যারট্রিজ বেরিয়ে আসার পূর্বক্ষণেই আমি রিসিভার তুলে নিই, হ্যালো?

শুনলাম, মেগান ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমাকে তার কাছে একবার আসতে বলছে। আমি রাজী হলাম।

আমি সিমিংটনের বাড়ি যেতেই মেগান আমাকে জড়িয়ে ধরল। ও কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাকাসে মুখে বলল, আমি সিঁড়ির তলায় কাপবোর্ডের ভেতরে অ্যাগনেসকে মৃত অবস্থায় দেখেছি। আমি ওর বাইরে যাবার পোশাক কামরাতে পরে থাকতে দেখে ওকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে দেখতে পেলাম। মেগানের থেকে আরো জানলাম, মিঃ সিমিংটন পুলিশকে ফোন করেছে।

ইতিমধ্যে ওদের রাঁধুনী রোজের কাছ থেকে জানলাম, অ্যাগনেসকে মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর থেকেই কেমন বিচলিত দেখাত আর সে ক্রমে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল, কেবলই বলত ওর কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না।

একসময় এলসির সঙ্গে দেখা হয়, ও আমাকে দেখেই বলল, উঃ কী ভয়ানক, এমন শয়তানি কাজ কে করতে পারে? আর বেচারী অ্যাগনেস, আমার মনে হয় না ও কারোর ক্ষতি করতে পারে। এলসি চলে গেল।

তারপর একটা দরজা খুলে গেল, সুপারিন্টেন্ডন্ট ন্যাস ঢুকলেন, পিছনে মিঃ সিমিংটন। উনি আমাকে দেখে খুশী হলেন। মিঃ সিমিংটনকে তিনি প্রাতঃরাশ খেয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে আমাকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, খবর পেলেন কিভাবে। আমি জানালাম, মেগান ফোন করেছিল। তাকে আরও জানালাম, প্যারট্রিজকে অ্যাগনেসের ফোন করা এবং শেষ অবধি তার না আসার কথা। এবার আমি প্রশ্ন করি ন্যাসকে, ঠিক কি ঘটেছিল?

কাজের মেয়েদের ছুটির দিন–হ্যাঁ, মনে হয় দুটি বোন এখানে কাজ করত। তারা একসঙ্গে বেরুতে চাইত বলে মিসেস সিমিংটন সেরকম ব্যবস্থা বহাল করে দেন। তারপর এ দুজন এলেও ঐ একই ব্যবস্থা বহাল থাকল। ওরা নিজেদের ঠান্ডা খাবার ডাইনিংরুমে রেখে যেত, শুধু মিস হালন্ড ওদের গরম চা দিত। একটা জায়গা পরিষ্কারের, রোজ নেদার মিকফোর্ডের বাসিন্দা বলে ছুটির দিনে তাকে সেখানে যেতে বেলা আড়াইটের বাস ধরতে হয়। তাই সবসময় অ্যাগনেসকেই দুপুরের বাসন মাজতে হত। শোধবোধের জন্য রোজ রাতে ফিরে এসে রাত্রি ভোজনের থালাবাসন মাজতো। কালও ঐ একই ব্যাপার হয়েছিল। দুটো পঁচিশে রোজ যায় বাস ধরতে, তিনটে বাজতে পঁচিশে সিমিংটন চলে যান অফিসে, এলসি বেরিয়ে যান তিনটে নাগাদ, পাঁচ মিনিট বাদে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায় মেগান। আমার যদ্র ধারণা, অ্যাগনেস সাধারণতঃ তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে বের হতো।

–তাহলে তখন বাড়িটা খালি পড়ে থাকে?

–ও বিষয় নিয়ে এখানকার লোকদের কোনো মাথাব্যথা নেই। যা বলছিলাম, তিনটে বাজার দশমিনিট আগে অ্যাগনেস একাই ছিল এবং ও যে বাড়ি থেকে বের হয়নি সেটা পরিষ্কার কারণ ওর গায়ে বাড়ির টুপি আর অ্যাপন ছিল।

–মৃত্যুর সময়টা জানতে পেরেছেন?

–হ্যাঁ, ডাক্তার গ্রিফিথের মতে দুটো থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। এটা তাঁর সরকারী রায়।

–কেমনভাবে খুন হয় মেয়েটি?

–মাথার পেছনে প্রথমে আঘাত করে নিঃসাড় করে দিয়ে, তারপর খুব ছুঁচলো করে শানানো একটা রান্নাঘরের সাধারণ নিকি তার ঠিক খুলির পেছন গোড়ায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

একটা বিরক্তি প্রকাশ করে ন্যাস বলল, সেই একই কুসংস্কার ওদের, পুলিশের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। ওর দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা আমাদের কানে এলে হয়তো ওকে বাঁচানো যেত।

-আপনি এ-ব্যাপারে আর কি জানতে পেরেছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

–আরো জানতে পেরেছি, মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যার দিন বিকেলে দুজন পরিচারিকারই বাইরে যাবার কথা, ওদের ছুটির দিন বলে। কিন্তু অ্যাগনেস বাড়ি থেকে বেরিয়েও ফিরে আসে। সে তার ছেলেবন্ধু র‍্যানডেলের সঙ্গে দেখা করতে যায়, র‍্যানডেল এর মধ্যে একটা উড়ো চিঠি পায়, যাতে ইঙ্গিত ছিল, অ্যাগনেসের ভজাবার মতো আরো ছোকরা আছে–অতএব বেঁধে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে ঝগড়া। আর অ্যাগনেস রাগ করে বাড়ি ফিরে আসে, বলল, ফ্রেড যতক্ষণ না মাফ চাইছে ও আর বেরুবেই না। এবার খেয়াল করুন, মিঃ বার্টন, মিসেস সিমিংটনের চিঠিটা এসেছিল বিকেলের ডাকে। এবং

সেটাতে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প লাগানো হয়েছিল। কিন্তু আসলে কেউ হাতে ভরে দিয়ে যায়। বিকেলের ডাক আসে পৌনে চারটে নাগাদ। অ্যাগনেস তার ছোকা বন্ধুর আসার অপেক্ষায় গেটের দিকে নজর রেখেছিল রান্নাঘরের জানলা দিয়ে।

আমি বললাম, আর সে দেখল সেই ব্যক্তিটিকে, চিঠিটাকে বাক্সে ঢোকাতে।

–ঠিক মিঃ বার্টন। অ্যাগনেস জানতো কে সেই পত্র লিখেছিল। কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল সব সন্দেহের উর্ধ্বে, কেননা সে ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, ভেবেছিল, কেউ একজন বাক্সে চিঠি ফেলে গেল। কিন্তু সে যে বেনামী চিঠির সঙ্গে জড়িত একথা তার মাথায় আসেনি বা ভাবতেই পারেনি সেই মূহুর্তে। কিন্তু পরে এ নিয়ে চিন্তা করতে থাকলে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং ঠিক করে প্যারট্রিজকে সবকথা খুলে জানাবে। কিন্তু কোনোক্রমে বিষকলম সেটা ধরে ফেলে।

–কিভাবে মিঃ ন্যাস?

–গ্রামদেশে খবর ছড়ানো এক তাজ্জব ব্যাপার। ঘরে ঘরে টেলিফোন। আপনি যখন ফোনে অ্যাগনেসের সঙ্গে কথা বলছিলেন কে কে শুনেছিল?

–আমার বোন, মিস গ্রিফিথ শুনে থাকতে পারে।

এদিকে অ্যাগনেসের কথা হয়তো মিস হল্যান্ড, রোজ ওরাও শুনে থাকবে। এছাড়া রেনডেল ছোকরাও ওদের ঝগড়া করে বাড়ি ফিরে যাওয়াতে ব্যাপারটা রটাতে পারে। এখন আমাদের হাতে দুটো নির্দিষ্টকাল বিকেল এবং এক সপ্তাহ আগের বিকেল।

-কাল কী ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা?

–আমার ধারণা বিশেষ এক মহিলা শান্ত, হাসিমুখে বিকেলের দর্শনার্থী হিসেবে কিংবা হাতে কোনো পার্সেল নিয়ে বেল টেপে। অ্যাগনেস খুলে দেয় এবং আগন্তুক তার পেছন ফেরার সুযোগে মাথায় আঘাত করে। এখানকার মহিলারা বড়ো ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে অভ্যস্ত। তাতে নিকি এনেছিল। আর পরে সেটা বেঁকিয়ে কাবার্ডে ফেলে দিয়ে যায়।

আমি প্রশ্ন করি, অ্যাগনেসকে কাবার্ডে পোরার কি দরকার ছিল?

মৃত্যুর সঠিক সময়টা গোলমেলে করে তোলার জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে মিস হল্যান্ড মৃতদেহ দেখতে পেলে মিনিট দশেকের মধ্যে ডাক্তার ডাকলেন।মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যাটা বিষকলমকে ভয় পাইয়ে দেয়। সে হাওয়া বুঝে ফেলে। এখন আমাদের একজনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, তিনি সম্মানিত, যাঁর সম্পর্কে সবার উঁচু ধারণা রয়েছে, বুঝলেন মিঃ বার্টন?

একটু পরে ন্যাসের সঙ্গে আমিও রোজের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এর মধ্যে ন্যাসের কাছে রোজ দু-রকম কাহিনী শুনিয়েছে। ন্যাস এবার মিঠে-কড়া পদ্ধতিতে রোজকে

জিজ্ঞেস করল, অ্যাগনেস কি কোনো ইঙ্গিতই দেয়নি, তার মনে কেন উদ্বিগ্ন থাকত? উত্তরে রোজ জানিয়েছে, না। রোজ আরও জানিয়েছে যে, সে বেলা আড়াইটার বাস ধরে নেদার মিকফোর্ডে পৌঁছে সারাটা বিকেল আর সন্ধে কাটিয়ে, সেখান থেকে আটটার বাস ধরে ফেরে।

এবার হল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করলাম। সেও জানালো, অ্যাগনেস তাকে কোনো মানসিক অস্বস্তির কথা জানায়নি কোনোদিন। এছাড়া সে আরও জানালো যে, সে ছেলেদের নিয়ে মাঠের ধার ধরে মাছ কিনতে গিয়েছিল। মাছের টোপ নিতে ভুলে গিয়েছিল বলে, আবার বাড়ি ফেরে তিনটে বাজতে কুড়িতে..বা তার সামান্য পরে। সে সময় মেগান আসছিল, পরে মন বদলালো, সে বাইসাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছিল। মেগান নিশ্চয়ই রওনা দিয়েছিল আর অ্যাগনেসকে সে তখন দেখেনি।

–কটার সময় বাড়িতে ঢোকেন?

–পাঁচটা বাজতে দশে। ছেলেদের ওপরে চা দেবার ব্যবস্থা করি। সিমিংটন এলেন, ছেলেদের পড়ার ঘরে চা খাবেন বললেন। আমি নিচে গিয়ে তার চা নিয়ে এলাম।

-সাধারণ সময়ে কেউ যায় ঐ কাবার্ডটার দিকে?

-না, না। স্রেফ হাবিজাবি জিনিস রাখার জায়গা ওটা, মাসের পর মাস কেউ হয়তো ওটার দিকে যায় না।

–বিকেলের ডাকগুলো কে ওপরে নিয়ে যেত?

–আমি ফেরার সময় চিঠির বাক্স দেখে চিঠি থাকলে তা হলকামরার টেবিলে রেখে দিতাম। মিসেস সিমিংটন নিচে নেমে এসে চিঠি নিয়ে যেতেন।

-ঐ বিষ চিঠিটা সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মত কি? আপনি ও ধরনের চিঠি পেয়েছেন?

–না, একেবারেই তা মনে হয় না। মিসেস সিমিংটন ছিলেন স্পর্শকাতর, শুচিবেয়ে...ও ধরনের কিছু...মানে...হতেই পারে না। আর আমি সত্যিই ও-ধরনের কোনো চিঠি পাইনি।

ন্যাস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ বার্টন, যা শুনবেন সবই বিশ্বাস করবেন না। মিস বার্টনও এধরনের চিঠি পেয়েছিলেন। তার পুরানো রাঁধুনিটার কাছে খবর পেয়েছি। তাহলে উনি একথা আমার কাছে লুকোলেন কেন?

সুরুচির পরিচয়, অশ্লীল বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। চিঠির বক্তব্য ছিল, উনি ওঁর মা, বোনেদের বিষ খাইয়ে মেরেছেন।

.

# ০৯.

এ বাড়ি থেকে বেরুবার আগে আমি মেগানকে খুঁজে বের করে আবার একটু অনুরোধ জানালাম যাতে আবার কিছু দিন আমার সঙ্গে এসে থাকে। কিন্তু সে অরাজী হওয়ায় আমি আর ন্যাস লিটল ফার্মে ফিরে এলাম।

ন্যাস প্যারট্রিজের কাছে কিছু জানবার আগ্রহ নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি আশাহত হলেন, নতুন কিছু বার করতে পারলেন না। প্যারট্রিজ আপনাদের ঠিকে ঝি মিসেস এমোরিকে অ্যাগনেসের ফোনের ব্যাপারে বলেছিলো, এবার এমোরির মাধ্যমে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে থাকবে।

ন্যাস জোয়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস বার্টন, আপনার নামের চিঠিটার খামটা লক্ষ্য করেছিলেন? সেখানে চিঠিটার প্রকৃত প্রাপকের নাম ছিল, মিস বার্টন পরে র কেটে ট করা হয়েছিল।

এরপর ন্যাস বিদায় নিলেন। জোয়ানা আমাকে বলল, চিঠিটা যদি এমিলির উদ্দেশ্যে লেখা হয়, তাহলে শুরুতে ওহে রংমাখা ঘর জ্বালানি-কথাটা থাকবে কেন? জেরি, তোমার উচিত ছিল শহরে গিয়ে সবাইকার মতামত যাচাই করা।

আমি জোয়ানাকে আস্তে আস্তে বললাম, দ্যাখ, ঐ অ্যাগনেস মেয়েটা প্যারট্রিজকে কী বলেছিল, সেটা আমরা শুধু ওর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। ধর যদি অ্যাগনেস বলে, কেন সেদিন প্যারট্রিজ এসে চিঠিটা ফেলেছিল?..হয়তো প্যারট্রিজ উত্তরে বলে, সে বিকেলে ওর কাছে গিয়ে সব ব্যাখ্যা করে বলবে।

কিন্তু চিঠির সূত্রগুলো নষ্ট করার মতো মনোভাব বা জ্ঞান প্যারট্রিজের আছে বলে আমার মনে হয় না।

জোয়ানা বলল, আমার মনে হয় মধ্যবয়েসী মিঃ পাই এর সঙ্গে জড়িত।

–ভুলিস না তিনিও একটা ওরকম চিঠি পেয়েছেন। ওটা আমাদের অনুমান। উনি যথেষ্ট চালাক এবং তাঁর পূর্বপরিকল্পিত অভিনয় আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকতে পারি।

.

জোয়ানার কথামতো হাইস্ট্রিট ধরে যেতে যেতে প্রথমে গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা হলো। ওকে ভীষণ অসুস্থ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু কেস সম্প্রতি দেখেছে। তার মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়ানো উন্মাদটিও আছে।

.

গ্রিফিথ জানালো সে জোয়ানাকে কিছু ফটোগ্রাফ দিতে যাবে। গ্রিফিথ চলে গেল।

এরপর তার বোন মিস গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা।

আমাকে পেয়েই গমগমে গলায় বলতে শুরু করল, কী বীভৎস ব্যাপার! ঐ অ্যাগনেস মেয়েটার মুখটাও আমি মনে করতে পারছি না। আমার মনে হয় ওরই কোনো বয়ফ্রেন্ড একাজ করে থাকবে।

আমি কথা ঘুরিয়ে বলি, বলুন তো মিস গ্রিফিথ, আপনিই কি মেগানকে বাড়ি ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ, মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর থেকেই লোকে বলছে, মিস হল্যান্ড নাকি দুনম্বর মিসেস সিমিংটন হবার জন্যে মিঃ সিমিংটনের কাছে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তার মতো নিখুঁত মেয়ে শুধু নিজের কর্তব্যটুকুই করে চলেছে। মেয়েটার জন্যে আমি দুঃখ পাই। মোটামুটি সে কারণেই আমি মিস মেগানকে বাড়ি ফিরে যেতে পরামর্শ দিই। বাড়িতে শুধু ডিক আর হল্যান্ড থাকার চেয়ে এ বরং ভালো দেখাবে। একথা বলে সজোরে হেসে সে পা বাড়ালো।

.

চার্চের কাছেই পেয়ে গেলাম মিঃ পাইকে। উনি এমিলি বারটনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। –এই যে বার্টন, সুপ্রভাত! জোয়ানা কেমন আছে?

-ভালো আছে।

-উনি আবার আমাদের গ্রাম্য পার্লামেন্টে যোগ দেননি তো? আরে খুনের ব্যাপারটা বলছিলাম। একটি সামান্য কাজের মেয়ের পাশবিক হত্যা, অবশ্য অপরাধের বিচারে এটা একটা খবর তো বটেই।

আমি পাইকে জিজ্ঞেস করি, কাল মিস গ্রিফিথ আপনাকে আর মিস অ্যাগনেসের কাল বিকেলে প্যারট্রিজের কাছে চা খাবার কথা ছিল–একথা বলেছিল আপনাকে?

সেরকমই তো বলছিল। ও বলেছিল, এ তো নতুন প্রথা দেখছি চাকর-বাকর আজকাল তাদের মালিকদের ফোন ব্যবহার করছে।

মিস এমিলি বললেন, প্যারট্রিজ এমন কাজ করবে আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। এসব আমি আর সইতে পারছি না, বলে মিস এমিলি হাঁটা মারলেন।

আমি পাইকে বললাম, এইসব ঘটনাগুলো সম্পর্কে আপনার প্রকৃত ধারণা কি?

-আমার মতে, বাইরে থেকে আপাত সম্ভাবনাহীন লোকই অনেক সময় এসব কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে। সব রীতিমতো উন্মাদ, বুঝলেন মশাই।

-কে?

তার চোখের দৃষ্টি আমার ওপর। হেসে বললেন, না না, বার্টন, সে তো বদনাম করা হবে। এত কিছুর ওপর বদনাম জিনিসটা করতে চাই না। উনি প্রায় লাফিয়েই রাস্তা ধরলেন।

.

চার্চের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ধীরে ধীরে খুলে গেল চার্চের দরজা। বেরিয়ে এলেন মাননীয় পাদ্রি কালেব ডেন কলপ।

সুপ্রভাত মিঃ...ইয়ে..ইয়ে

আমি বলি, বার্টন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়। আজ দিনটা বড়ো চমৎকার, তাই না। আমি সংক্ষেপে বলি, হ্যাঁ।

–কিন্তু ঐ কী যেন...মেয়েটা সিমিংটনের বাড়িতে কাজ করত, সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন যে আমাদের মধ্যেই একজন খুনী রয়েছে।

-হ্যাঁ, কেমন যেন উদ্ভট ব্যাপার! আমি বলি।

কাপুরুষের কাজ, ইতর ভীরুতা—

আমি বললাম, বিলকুল!

.

লাঞ্চের মিনিট কয়েক আগে বাড়ি ফিরে দেখি জোয়ানা আনমনে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরের বারান্দায় এসে দেখি দুখানা চেয়ার, দুটো খালি শেরীর গ্লাসের পাশে একটা বস্তু রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম জোয়ানাকে, এটা কি?

-ওঃ, ওটা একটা ফটোগ্রাফ–রোগাক্রান্ত পিলের। আমি আগ্রহভরে ফটোগুলো দেখলাম। হয়তো জোয়ানা মিঃ গ্রিফিথের কাছে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

যাই হোক, আমি ছবিগুলোকে রাখার জন্যে একটা বইয়ের সন্ধান করতে করতে বুককেসের তলার তাক থেকে একটা ভারী বই টেনে বের করি। কোনো এক বিস্ময়কর কারণে সেই ধর্মীয় গ্রন্থের পাতাগুলো অনায়াসে খুলে গেল। দেখলাম, বইটার মাঝখান থেকে অনেকগুলো পাতা পরিচ্ছদভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত। আর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এই বইয়ের পাতাগুলো থেকে বেনামী চিঠির শব্দগুলো কেটে সাজানো হয়েছে।

সন্দেহের তালিকায় প্রথমেই এমিলি বারটনের কথা মাথায় এল। কিন্তু তার ঘরে অন্য কোনো আগন্তুক অর্থাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কেউ আসতে পারে! সেও পাতাগুলো কাটতে পারে! প্যারট্রিজও কেটে নিতে পারে! এমিলির ড্রয়িংরুমে তো অনেকের অবাধ প্রবেশ ছিল। মিঃ পাই, এইমি গ্রিফিথ, মিসেস কলপ।

.

বইটা নিয়ে আমি আর জোয়ানা থানায় এলাম।

গ্রেভস ছিলেন না, শুধু ন্যাস। উনি বইটা পেয়ে উল্লসিত হলেন এবং পরীক্ষার জন্য পাঠালেন। আমার আর প্যারট্রিজের আঙুলের ছাপ ছাড়া কিছু পেলেন না তিনি। ঝাড়পোঁচ করার জন্যেই প্যারট্রিজের হাতের ছাপ রয়েছে।

ন্যাস আর আমি উত্রাইয়ের পথে হেঁটে চললাম।

ন্যাস বললেন, জাল ক্রমশ গুটিয়ে আনছি মিঃ বার্টন। এখন বাকি মিস গিঞ্চ। কাল বিকেলে এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আর মক্কেলের বাড়ি সিমিংটনের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। এছাড়া মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যার দিনটিই ছিল গিঞ্চের সিমিংটনের অফিসে শেষ কাজের দিন। ঐদিন সে বেলা তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কিছু বেশি দামের স্ট্যাম্পের ঘাটতি পড়ায় অফিস থেকে কিছুক্ষণের জন্য বের হয়। কাজটা বেয়ারা দিয়েও হতে পারত কিন্তু উনি বলেন তার মাথা ধরেছে, একটু ভোলা বাতাসের প্রয়োজন। এইটুকু সময়ই একটা চিঠি গুঁজে ফিরে আসার পক্ষে যথেষ্ট। তবে প্রতিবেশী কেউ তাকে দেখেনি।

-আপনার থলিতে আর কি আছে?

-মিস গ্রিফিথ। উনি কাল ব্রেনটনে গার্ল মিটিং-এ গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন অনেক দেরিতে। তাকে তত বেশ স্থির বুদ্ধির মহিলা বলেই মনে হয়।

আগের সপ্তাহেও বাক্সের মধ্যে তিনি চিঠি গুঁজে এসেছিলেন?

–হতে পারে। কাল বিকেলে একটু জলদিই বাজারে গিয়েছিলেন। আর আগের হপ্তায় হেঁটে গিয়েছিলেন সিমিংটনের বাড়ি ছাড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে।

আমি ধীরে ধীরে বলি, তাহলে কেটেছেটে চারজন দাঁড়াচ্ছে সন্দেহের তালিকায়, মিস গিঞ্চ, মিঃ পাই, মিস গ্রিফিথ আর মিস বারটন?

-ও, না না। আরো গোটা দুয়েক এবং মিসেস কলQপও রয়েছেন। উনি নাকি কাল বিকেলে জঙ্গলে পাখি অবলোকন করছিলেন–পাখিরা তো তার হয়ে সাক্ষী দেবে না?

আওয়েন গ্রিফিথকে দেখে ন্যাস ওর দিকে তাকালেন।

–হ্যালো ন্যাস। আমাকে নাকি খুঁজছিলে?

–হ্যাঁ, শুক্রবারে ময়নাতদন্ত, যদি আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

–ঠিক আছে। আজ রাতেই পোস্টমর্টেম করব।

–আচ্ছা মিঃ গ্রিফিথ, মিসেস সিমিংটন কিছু তৈরি ঔষুধ, পাউডার খাচ্ছিলেন, সেটা একটু বেশি মাত্রায় পড়লে মৃত্যু ঘটতে পারত?

-যদি অবশ্য একসঙ্গে পঁচিশ ডোজ খেতেন। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না, পরিষ্কার সায়ানাইড বিষ। সায়ানাইডে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু উনি যদি ঘুমের ঔষধ খেতেন বেশি ডোজে, তাহলেও আপনি রুগীকে ফের সুস্থ করে তুলতে পারেন, মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটলে।

গ্রিফিথকে ন্যাস ধন্যবাদ জানালো। ও বেরিয়ে গেল। আমিও ন্যাসের কাছে বিদায় চেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। জোয়ানা বেরিয়েছে। টেলিফোনের খাতাটাতে লেখা, ডাঃ গ্রিফিথের ফোন এলে যেন বলি, মঙ্গলবারে আমি পারছি না, একেবারে বুধ বা বৃহস্পতিবারে যাওয়া সম্ভব হবে।

হঠাৎ বিরক্তি জাগল, আওয়েনের হঠাৎ আসায় ন্যাসের উল্লেখিত আরো দুজন কথোপকথনে আমাদের ছেদ টানতে হয়। কে হতে পারে সেই আরো দুজন সম্ভাব্য ব্যক্তি?

আমার চেতনায় অনেকগুলো নাম ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি ড্রয়িংরুমে একটা চেয়ারে বসে চিন্তা করতে থাকি। ঘুম প্রায় এলো বলে।

দু-এক মিনিট ঘুমিয়েছি কিনা সন্দেহ একটা সজোর কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল।

–এ ব্যাপার বন্ধ করতেই হবে। এইসব চিঠি, খুন। অ্যাগনেসের মতো নির্দোষ মেয়েদের খুন হওয়া চলতে দেওয়া যায় না।

আমি চমকে উঠে বসি, বলি, কি করতে বলেন আপনি? পুলিশ তো যথাসাধ্য করছে।

–তাদের কাজের নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। অ্যাগনেস খুন হয়ে গেল। আমি একজন সত্যিকারের বিশারদকে ডেকে আনতে যাচ্ছি। আমি যার কথা বলছি উনি চিঠি বিশারদ না হতে পারেন, কিন্তু তিনি মানুষ চেনেন। যিনি বদমায়েশি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই তার প্রস্থান ঘটেছে।

.

# ১০.

অ্যাগনেসের ময়না তদন্তের আদালত বসলো। রায় বের হলো অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দ্বারা হত্যা।

প্রায় প্রত্যেকের চোখেই আশঙ্কা, আধা উৎসুক চাহনির ঝিলিক।

সন্ধ্যা হলেই জোয়ানা আর আমি জানালার পর্দা টেনে সম্ভাব্য নামগুলো নিয়ে খতিয়ে দেখার আলোচনাই চালাই।

এরমধ্যে এমিলি বারটন চা খেতে এসেছিলেন। মেগান এসেছিল লাঞ্চে। মিঃ গ্রিফিথ তার প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত। একদিন পাইয়ের ওখানে শেরী পান করে এলাম। এরপর একদিন গেলাম ভিকার সাহেবের বাড়িতে।

দেখলাম, মিসেস কলপের সেই শেষ সাক্ষাৎকারের মারমুখী মেজাজ শান্ত হয়ে গেল। উনি এখন ফুলকপি আর বাঁধাকপির চারাগুলো নিয়ে ব্যস্ত।

অতিথি মিস মারপল খবরটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উনি অ্যাগনেস খুনের ব্যাপারে সমস্ত কিছু শুনলেন আমাদের মুখে। সবকিছু শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন।

.

এর ঠিক দুটি রাত পরে আমি একা গাড়িতে করে ফিরছি হ্যাম্পটদ থেকে। অন্ধকার নেমে এসেছে, লিমস্টকে ঢোকার মুখে বাতিতে কিছু গণ্ডগোল হতে নেমে গোলমালটা সারিয়ে ফেললাম।

সামনেই অবস্থা দেখা যাচ্ছে কতকগুলো বাড়ির তার মধ্যে একটা মহিলা-ইনস্টিটিউট বাড়িটাও। মনের প্রবল ইচ্ছের তাড়নায় আমি সেখানে ঢুকতে চাইলাম। মনে হল কোনো আবছা গোপনকারী সটকে গেটের ভেতর ঢুকল।

গেটটা সামান্য খোলা ছিল, ঢুকে একটুখানি পথ গিয়ে, চারটে ধাপ সিঁড়ি উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার পাশেই টের পেলাম একটা মেয়েদের পোশাকের খসখস শব্দ।

আমি চট করে বাড়িটার কোণায় গেলাম। তারপর বাড়ির পেছনে। আমার দুফুট দূরেই একটা খোলা জানলা ছিল।

গুটি মেরে শোনার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলাম না। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হল কেউ ভেতরে রয়েছে।

আমি জানালার গ্রিলের ওপর ঝুঁকতে গিয়ে একটু আওয়াজ করে ফেলেছি। তখুনি একটা ক্ষীণ শব্দ পেলাম। পকেটে টর্চ ছিল, বোতাম টিপতেই শুনি–নেভান ওটা।

উনি আমাকে পাকড়ে একটা দরজার ভেতরে নিয়ে এসে বললেন, মিঃ বার্টন, ঠিক এই মুহূর্তটাতেই আপনার এখানে আসার সময় হল?

–দুঃখিত, ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

কাউকে দেখেছেন?

–সঠিক বলতে পারছি না, মনে হল সামনের গেট দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেখলাম।

ব্যাপারটা ঠিকই। একজন কেউ এসেছিল। একজন বেনামী চিঠির লেখক চিঠি না লিখে থাকতেই পারে না, এই তথ্য নির্ভর করে আমি এখানে এসেছি। সে একই মেশিনে ওগুলো টাইপ করতে চাইবে। অন্য মেশিন বা হাতে লেখার ভরসা পাবে না।

এরপর রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে আসি। আমার গাড়ির পাশে একটা আবছা ছায়া। চিনতে পারলাম মেগানকে।

হ্যালো, এখানে কি করছিলে মেগান?

–আমি তো বেড়াতে বেরিয়েছি। রাতে বেড়াতে ভালোবাসি। রাতে সবকিছু কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে।

আমি ওকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলাম বাড়িতে। সিমিংটন মেগানের ওপর রাগ করলেন। আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনিই ওকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে ধরে নিতে পারি। ভাবলাম ঐভাবেই প্রশ্নটা থাক।

# ১১.

পরের দিন আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মাসান্তিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে লন্ডনে মার্কাস কেন্টের কাছে যাবার কথা। ট্রেনেই যাবো। জোয়ানা গাড়িটা নিয়ে স্টেশনে পার্ক করিয়ে রাখতে বলল। ফেরার পথে নিয়ে চলে আসতে বলল, কারণ তার এখন গাড়ির দরকার নেই।

গাড়ি চালিয়ে অর্ধেক রাস্তা যেতে দেখি মেগান উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও চলেছে। গাড়ি থামাই।

-হ্যালো, তুমি এখানে কী করছ?

–এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। ঠিক বিশেষ কোথাও যাচ্ছি না।

আমি ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বললাম, তাহলে চলো, আমাকে স্টেশন অবধি পৌঁছে দেবে। আমি ডাক্তার দেখাতে লন্ডন যাচ্ছি। গাড়িটা পার্ক করিয়ে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম।

দেখলাম মেগান একজোড়া ভোতা ওভারসু পায়ে দিয়েছে। মোটা মোজা দিয়ে আকারহীন জায়পার স্কার্ট পরেছে। আমার বিরক্ত লাগল, গাড়ি এল, ফাস্টক্লাস কামরায় উঠে জানলা নামিয়ে মেগানের সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম। ট্রেন চলতে শুরু করলে, মেগানের উঁচুতে ভোলা মুখখানার দিকে তাকালাম।

হঠাৎ মাথায় পাগলামী চেপে বসল, দরজা খুলেই মেগানকে এক হাতে মাল তোলার মতো করে টেনে নিলাম।

–এমন কাণ্ড কেন করলেন?

–তুমি আমার সঙ্গে লন্ডন যাবে। একটু চেষ্টা করলে তোমাকে কেমন দেখাতে পারে, সেটা তোমাকে দেখিয়ে দিতে চাই।

টিকিট কালেক্টর এলে আমি ওর জন্যে একটা রিটার্ন টিকিট কাটলাম।

লন্ডনে পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা জোয়ানার পোশাক নির্মাতার দোকান মিরোটিনে।

দোকানের আসল মালিক মেরী গ্রে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। তাকে বললাম, আমি মামাতো বোনকে এনেছি (মিথ্যে বললাম)। ওর আপাদমস্তক যেমনটি হওয়া প্রয়োজন, তেমনি করে দিন। মোজা, জুতো, অন্তর্বাস সবকিছু। আর জোয়ানার চুলের সজ্জা করে যে

মহিলা, তার কাছে নিয়ে গিয়ে ওর চুলটাও ঠিক করে দেবেন। খরচ যত হয় হবে। আমি ছটা নাগাদ এসে ওকে নিয়ে যাবো।

মাকার্স কেন্ট আমায় পরীক্ষা করে বললেন, আমি নাকি তার চরম প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছি।

ছটায় মিরাটিনে পৌঁছালাম। মেরী গ্রে আমাকে বড়ো শোরুমটার ভেতরে নিয়ে গেলেন। মেগান একটা লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। হলপ করে বলছি, তাকে চিনতেই পারিনি। দীর্ঘাঙ্গী, সুচারু পদসন্ধি, তাতে রেশমের মোজা, সুনির্বাচিত পাদুকা ওকে যেন খানদানি আর স্বতন্ত্র করেছে। এর মধ্যে সদ্য ফুটে ওঠা নিষ্কলুষ গর্ব ফুটে উঠেছে।

আমি ওকে নিয়ে রেস্তরাঁয় ডিনারে ঢুকলাম। ওকে পাশে নিয়ে চলতে তখন বেশ গর্ব অনুভব হচ্ছিল।

প্রথমে হালকা পানীয় নিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম দুজনে। তারপর খেয়ে নিলাম। এরপর দুজনে নাচতে শুরু করলাম। ভালোই নাচল ও–আমার বাহুর মধ্যে ও যেন পালকের মতো হালকা, নাচের প্রত্যেকটা ছন্দ ওর চরণ আর দেহ স্পর্শ করেছে।

আমার মাথায় তখন পাগলামির সুর দোলা খাচ্ছে। সেই সুরের তাল ভঙ্গ করে মেগান বলল, আমাদের এখন ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। তাই না?

আমি তখন খেয়াল করলাম শেষ ট্রেনটা বেরিয়ে যাবার সময় পেরিয়ে গেছে। মোটর গাড়ি ভাড়ার কোম্পানি লিউয়েলিম-কে ফোন করে সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়িটা শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে বললাম।

এসেও গেল। আমি তাতে মেগানকে চড়িয়ে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। ওর কথামতো রোজ-এর জানলায় ঢিল ছুঁড়লাম।

রোজ বেরিয়ে এল। সে জানাল, সে নাকি মনিবকে বলেছে, মেগান বিছানায় ঘুমচ্ছে। সে জানতো না যে মেগান বেরিয়েছে।

যাই হোক, মেগানকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। শোফারকে বকশিস দিয়ে শুভরাত্রি জানালাম।

জোয়ানা দরজা খুলে দিল। ওকে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সবকিছু জানালাম। সব শুনে জোয়ানা হেসে বলল, হে ভগবান, আমি বেশ বুঝছি মেয়েটাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

বলি বিয়ে করতে হয় করব। আপত্তি কিসের? সত্যি বলতে কি, হলে ভালোই হয়।

–হ্যাঁ সেটা আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি। জোয়ানা হেসে বলল।

.

# ১২.

এরপর একদিন মিঃ সিমিংটনের বাড়িতে গেলাম মেগান-এর সঙ্গে দেখা করে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেব বলে।

রোজ আমাকে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে ভেতরে গিয়ে মেগানকে ডেকে দিলো। ওকে দেখে প্রথমে আমি কি বলে সম্বোধন করব বুঝতে পারছি না।

মেগানই হেসে বলল, হ্যালো।

আমি তাকে বললাম, তোমার কাছে এলাম কারণ আমার কিছু বলার আছে।

-বলো, মেগান বলল।

–তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে, আমার ধারণা আমাকেও তোমার ভালো লাগে।

–ভীষণ রকম!

–তাই মনে হয়, ভালো বুদ্ধি হবে যদি আমরা বিয়ে করে ফেলি।

–ওহ! অবাক দেখায় ওকে। বলল, তাহলে তুমি বলতে চাও সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চাও। মানে তুমি আমার প্রেমে পড়েছ?

-হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।

–কিন্তু আমি তো তোমার প্রেমে পড়িনি।

–আমি ভালোবাসতে শেখাব তোমাকে।

–ভালোবাসতে কেউ আমাকে শেখাবে, তা আমি চাই না। এরপর ও একটু থেমে বলল, আমি তোমার পছন্দের স্ত্রী হতে পারব না। ভালোবাসার চেয়ে ঘেন্নাটাই আমার বেশি আসে।

-ঘেন্না বেশিদিন টেকে না, ভালোবাসা স্থায়ী হয়।

–ওটাই কি সত্যি? বলে মেগান স্থির হয়ে গেল।

–তাহলে তুমি আমাকে কোনো আশাও দিচ্ছে না।

–তাতে লাভ কি?

–হয়তো কিছুই নয়, তবে আমি আশা করে যাবো।

.

একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে বাড়িটা থেকে বের হলাম।

আমি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সিমিংটনের সঙ্গে দেখা করবো–এই কথা ভেবে আমি ওঁর অফিসে গেলাম।

তাকে জানালাম, সুপ্রভাত, মিঃ সিমিংটন। আজ আমি কোনো পেশাদারী কাজে আসিনি, এসেছি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে। আপনি হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন যে আমি মেগানের প্রেমাসক্ত। আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম, কিন্তু সে অস্বীকার করছে। আমি অবশ্য সেটাকে চূড়ান্ত বলে মনে করি না।

দেখলাম সিমিংটন আমার প্রস্তাবটাকে হাস্যকর, সহজভাবেই নিলেন। তার পরিবারের উটকো ঝামেলা মেগানের বিয়ে হয়ে গেলে তিনি পরম স্বস্তি পাবেন।

সিমিংটন বললেন, প্রস্তাবটা ভালোই। আমি রাজীও। তবে সবকিছু মেগানের ওপরই নির্ভর করছে।

আমি পরম সৌহার্দ্যের মধ্যেই তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

.

বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ এমিলি বারটনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সুপ্রভাত, মিঃ বার্টন, শুনলাম কাল লন্ডনে গিয়েছিলেন।

–হ্যাঁ, আমাকে ডাক্তার দেখাতে যেতে হয়েছিল।

চাপা গলায় এমিলি বললেন, শুনলাম আরেকটু হলেই মেগান ট্রেন মিস করত। সে নাকি চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ওঠে।

আমি তাকে টেনে তুলতে সাহায্য করি। আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম।

.

বাড়ি ফিরে প্যারট্রিজের মুখে শুনলাম জোয়ানা বেরিয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার বোনটি আজকাল বড়ো রসহ্যময় হয়ে উঠেছে।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় জোয়ানা হুড়মুড় করে বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকল। মুখখানা লাল টকটকে। জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার।

-ওঃ কী একটা ভয়ানক দিন গেল।

–কেন, কী হয়েছে?

-টিলার ওপর দিয়ে একটু এমনিই বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মাইলের পর মাইল হেঁটে চললাম। ওখানে নিচু মতো একটা জায়গায় খামার বাড়ি রয়েছে দেখে আমি তেষ্টা মেটাতে ওখানে দুধ কিংবা কোনো পানীয় পাওয়া যায় কিনা দেখতে বাড়িটার উঠোনে ঢুকে পড়লাম। দেখি দরজা খুলে বেরিয়ে এল আওয়েন।

সে নার্সের অপেক্ষা করছিল। কারণ ঘরের ভেতর একজন মহিলার তখন প্রসব হচ্ছে। মানে বাচ্চা হতে ঝামেলা হচ্ছিল।

আমাকে দেখে আওয়েন নার্সের কাজটা আমাকে দিয়ে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো বিবেচনা করে করাতে চাইল। আমি বললাম, ওসব আমার কিছুই জানা নেই।

আওয়েন ভয়ানক চটে বলল, একজন মেয়ে হয়ে আর একজন মেয়েকে সাহায্য করতে পারছে না। আগে তো এমন ভাব দেখাতে যেন কতই ডাক্তারিতে আগ্রহ আর নার্স হবার

কতই না ইচ্ছে। কিন্তু বাস্তব কাজের সময়ে তুমি অকেজো, অপদার্থ সাজগোজ করা পুতুল।

ওর কথায় আমি অবিশ্বাস্য কাজটা করে ফেললাম জেরী। একে একে ওর হাতে আমি গরম জলে ফোঁটানো ছুরি, কাঁচি, নানা জিনিস দিলাম। বলতে কী ভালো কাজই একখানা করলাম। মা এবং বাচ্চাটা এখন সুস্থ। ওঃ ভগবান!

আমি তখন জোয়ানাকে পলের লেখা খামটা দিলাম। ও একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি পরিষ্কার বুঝলাম, পলের লেখা অবহেলিত চিঠিটা ওর মন থেকে পল নামক ব্যাধিটা মুছে দিয়েছে।

.

# ১৩.

প্রত্যাশার বিষয়গুলো কখনো সময়মতো আসে না। পরদিন সকালে হঠাৎই টেলিফোনে ন্যাসের গলা, আমরা মহিলাটিকে ধরেছি, মিঃ বার্টন! একবার থানায় আসতে যদি আপত্তি না থাকে, চলে আসুন।

থানায় গেলাম। ন্যাস জানালেন, অনেক দৌড়ঝাঁপ করে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছালাম। টেবিলের ওপর একখানা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখুন। পড়লাম।

একটি মৃত স্ত্রীলোকের জায়গা দখল করার ভাবনায় তোমার কোনো ফায়দা হবে না। এই মুহূর্তে কেটে পড়ো। এটা আমার সতর্কবাণী। অন্য মেয়েটির কি হয়েছিল মনে আছে? শেষের দিকে অশ্লীল গালিগালাজ।

ন্যাস বললেন, আজ সকালে এটা মিস হল্যান্ডের কাছে এসেছিল।

-কে লিখেছে এটা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ন্যাসকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার মুখ থেকে উল্লাসের ভাবটা খানিকটা উবে গেছে। বললেন, মিস এইমি গ্রিফিথ।

.

সেদিন ন্যাস, সার্জেন্ট পারকিন্স ওয়ারেন্ট নিয়ে গ্রিফিথের বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাড়িতে ঢুকে ড্রয়িংরুমে আমাদের বসানো হলো। এলসি হল্যান্ড, মেগান আর সিমিংটন ওখানে চা পান করছেন।

এইমিকে ন্যাস আড়ালে ডেকে নিলো কথাবার্তা বলার জন্যে। এইমিকে আমাদের ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে স্টাডিরুমে নিয়ে গেল। ড্রয়িংরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় লক্ষ্য করলাম সিমিংটনের মাথাটা ঝট করে খাড়া হয়ে উঠল আর তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ন্যাস তার বক্তব্য রাখলেন এবং এইমিকে আর হল্যান্ডকে লেখা চিঠিটা বার করে দেখালেন। ওর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটায় অভিযোগটা পড়ে শোনালেন।

এইমি হো হো করে হেসে উঠে সব কিছু অস্বীকার করে। তখন ন্যাস নিচুস্বরে বলে, মিস গ্রিফিথ, পরশু রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এই চিঠিখানা আপনাকে টাইপ করতে দেখে গেছে।

-আমি কখনো ওটা পোস্ট করিনি।

–ডাকটিকিটের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ছল করে ওটা মেঝেতে ফেলে দেয়, যাতে কেউ ওটা ডাকবাক্সে ফেলে দেয়।

এইসময় সিমিংটন দরজা খুলে ঢোকেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, এসব কী হচ্ছে? তোমার আইনত প্রতিনিধি রাখা উচিত এইমি। আমাকে সে কাজে

এইমি এবার ভেঙে পড়ে, দুহাতে মুখ ঢেকে বলতে থাকে, যাও তুমি, আমি চাই না তুমি এসব ব্যাপার জানতে পারো। চলে যাও ডিক।

সিমিংটন বেরিয়ে যাবার সময় আওয়েন গ্রিফিথ ঘরে ঢোকে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, কী ব্যাপার! আমার বোন-ন্যাস বলেন, আমরা দুঃখিত। মিস গ্রিফিথ আসুন, একজন সলিসিটর নিয়োগের সুবিধা আপনি পাবেন।

এইমি, আওয়েনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আওয়েন তাকে কিছু বলতে গেলে, ও বলে, আমার সঙ্গে কথা বলো না। দোহাই

এইমি চলে যেতে আওয়েন হতবাক হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। জোয়ানা ঘরে ঢোকে। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম, জোয়ানা তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

.

জোয়ানা যখন ঘরে ফিরল, দেখলাম ওর মুখখানা ফ্যাকাসে। আমার কাছে আসতে আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালে ও করুণ হেসে বলে, ডাঃ গ্রিফিথ কড়া মেজাজ দেখাচ্ছে, ও আমাকে গ্রহণ করবে না জেরি।

আমিও বললাম, আমার মেয়েটাও আমাকে চাইছে না।....মন খারাপ করিসনি সোনা। আমরা দুজনে তো রইলাম।

.

পরদিন আওয়েন জোয়ানার এমন গুণকীর্তন করতে লাগল যে অবাক হবার মতো। সে জোয়ানার কাছে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কিন্তু সে এতে রাজি হতে পারছে না কারণ, জোয়ানাকে তার নোংরা কলঙ্কিত পরিবারের সঙ্গে সে জড়াতে চায় না। আমি বিরক্তভরে আওয়েনকে বললাম, অতো মহৎ হবার তার প্রয়োজন নেই।

এইমির বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন পাকাঁপোক্ত। কারণ তার বাড়ির কাবার্ড থেকে এমিলির বইখানির পাতাগুলো পাওয়া গেছে। ন্যাসের মুখে এইরকমই শুনলাম।

লোহার শিকটা পাননি?

–ওটা তো সামান্য কাজ। ধুয়ে মুছে রান্নাঘরের দেরাজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বুড়ি মিস মারপলের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। মিসেস ক্লিটের কুটিরের কাছে ছোটো সাঁকোটার কাছে। তিনি কথা বলছিলেন মেগানের সঙ্গে। মেগান আমাকে দেখে হাঁটা শুরু করে দিল। ওকে আমি অনুসরণ করতে যেতে মারপল আমার পথ রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। ওর পেছনে যাওয়া বৃদ্ধির কাজ হবে না। এখন ওর সাহস বজায় রাখা খুবই দরকার। মহিলার কথা বলার ভঙ্গিমাতে এমন কিছু ছিল যাতে আমি ওঁকে ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়ির দিকে ফিরলাম না। গেলাম হাইস্ক্রিটে, পথে কর্নেল অ্যাপলটনের সঙ্গে দেখা। কোনোরকমে লোকটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে এগোতেই, তৃতীয়বার মারপলকে পুলিশ থানা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

.

আমার মগজে যে ঝড় উঠেছে, তা শান্ত হতে পারে একমাত্র মেগানের সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার পর।

সেদিন রাত সাড়ে নটার সময় সিমিংটনদের বাড়ি গেলাম। গেট পেরিয়ে মৃদু আলোক রেখাময় বৈঠকখানার জানলাটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

পর্দাগুলো পুরো টানা নেই, খুব সহজেই একটা ঝোঁপের পাশ কাটিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখলাম, মিঃ সিমিংটন একটা আরাম কেদারায় বসে আছেন আর এলসি মাথা নিচু করে বাচ্চার জামায় তালি সেলাই করছে এবং পারিবারিক কথাবার্তা বলছে। যেন, তারা ঠিক

করছে সামনের সিজনে ব্রায়ানকে উইনহেতে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেবে। অদ্ভুত রকম শান্তিময় একটা পারিবারিক দৃশ্য।

তারপর দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে এল মেগান। টানটান রুদ্ধ উত্তেজনা তার মুখে।

-আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একা।

সিমিংটন বিস্মিত হয়ে এলসি হল্যান্ডকে চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। এলসি চলে গেল।

সিমিংটন বললেন, মেগান, এবার বলল, কী বলছে? কী চাই তোমার?

-আমি কিছু টাকা চাই।

সিমিংটন একটু কড়া গলায় বলল, কাল সকাল অবধি সবুর করতে পারলে না? তুমি কি মাসোহারা কম পাচ্ছো? আর কটি মাস পরে তুমি সাবালিকা হলে আমি তোমার ঠাকুমার রেখে যাওয়া টাকা, সরকারী ট্রাস্টি তোমার হাতে তুলে দেব।

–আমি যথেষ্ট পরিমাণে টাকা চাই। আমার বাবা জেলে গিয়েছিলেন ব্ল্যাকমেলের অপরাধে আমি তো তারই মেয়ে, তার সঙ্গেই আমার মিল। সেদিন আমার মার ঘরে ওষুধের পুরিয়াগুলো নিয়ে আপনাকে যা করতে দেখেছি, তা প্রকাশ করে দেব।

সিমিংটন ভাবহীন, বিস্মিত হয়ে পড়লেন। তিনি একটু ফ্যাকাসে হেসে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চেক লিখে মেগানের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কিসের কথা বললে ঠিক বুঝতে পারিনি। এই তোমার চেক।

আমি ওঁর মুখখানা দেখে একটু বেসামাল হয়ে পড়তে শুনলাম কানের কাছে ন্যাসের ফিসফিস আওয়াজ, চুপ বার্টন, ঈশ্বরের দোহাই। আমাকে জোর করে বাড়ির পেছনে টেনে নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গে। আমি তাগিদের সুরে বলতে থাকি, মেয়েটা নিরাপদ নয়। ওকে এখান থেকে বের করে আনতেই হবে।

.

ন্যাসের কথামতো আমাকে চলতে হবে। আমার মোটেই ভালো লাগেনি...তবু হার মানলাম। আমি শপথ নিয়েছি, ওঁদের কথামতো সব হুকুম মেনে চলব।

সেই শর্তেই আমি, ন্যাস আর পারকিন্সের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। সিঁড়ির চাতালে জানলার কুলুঙ্গিতে ভেলভেটের পর্দার আড়ালে আমি আর ন্যাস লুকিয়ে রইলাম।

সিমিংটন চাতাল পেরিয়ে মেগানের ঘরে ঢুকলেন। আমি জানতাম পারকিন্স আগে থেকেই ভিতরে খোলা দরজার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, তাই ভরসা পেলাম কিছুটা।

দেখলাম, সিমিংটন মেগানকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসছেন আর রান্নাঘরের দিকে নিচের তলায় যাচ্ছেন। আমরাও অনুসরণ করলাম দূরত্ব বজায় রেখে।

সিমিংটন ওকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে গ্যাস চুল্লির মধ্যে ওর মাথাটা রেখে সবে ওকে শুইয়েছেন। আর গ্যাসটা চালু করে দিয়েছেন এমন সময় ন্যাস আর আমি আলো জ্বালালাম।

সিমিংটন ধ্বসে পড়লেন। অমি গ্যাসটা বন্ধ করে মেগানকে টেনে তুললাম।

.

উপর তলায় আমি মেগানের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছি আর বড়ো বেশি ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে ন্যাসকে গালমন্দ করেছি।

ন্যাস বলতে লাগল, বিছানার পাশে দুধের বাটিটায় সামান্য ঘুমের ওষুধ। ওকে বিষ দিয়েও মারতে পারত সিমিংটন কিন্তু এখন আর ওঁর দ্বারা কোনো রহস্যময় মৃত্যু ঘটাতে চাননি। যেন মায়ের মৃত্যুকে মেনে নিতে না পেরে অস্বাভাবিক ধরনের মেয়েটা গ্যাসচুল্লিতে মাথা রেখেছে এটাই সকলে বিশ্বাস করবে।

মেগানের জ্ঞান ফিরল। সে আমাকে তার আমার উদ্দেশ্যে লেখা অসমাপ্ত প্রেমের চিঠিটা দেখাল। যেটা লিখতে লিখতে সে ঘুমের ওষুধের প্রভাবে ঢলে পড়েছে।

.

# ১৪.

তাহলেই দেখেছেন মিঃ বাটন, বললেন মিসেস কলপ–একজন বিশেষজ্ঞ ডেকে এনে আমি ভুল করিনি কিছু।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। আমরা সবাই জুটেছি ওঁর বাড়িতে।

-কিন্তু আপনার বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকটি কে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

-ভদ্রলোক নয় হে, হাত ঘুরিয়ে দেখালেন মিস মারপলের দিকে, বললেন, ইনি। এ পর্যন্ত যত মানুষকে জেনেছি তাদের সকলের চেয়ে উনি নানা মানব চরিত্রের নিচ প্রবৃত্তি সম্পর্কে বেশি খবর রাখেন। মিস মারপল লক্ষিতভাবে বললেন, এভাবে বলো না ডিয়ার। মিসেস কলপ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, কিন্তু ওটাই তো সত্যি?

আমরা সবাই কিছু জানতে প্রত্যাশা করছি বুঝে মারপল খুন সম্পর্কে একটা বিনীত বিবৃতি দিলেন।

ঘটনাটা ধীরবুদ্ধির সিদেসাধা কেস...যদিও একটু অপ্রীতিকর। অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়াই খুনীর একমাত্র উদ্দেশ্য, বুঝলেন...সকলেই ভুল মিনিস্টার দিকে তাকাচ্ছে–

বেনামী চিঠি। আসলে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। চিঠির ব্যাপারটা কিন্তু বাস্তব মোটেই নয়।

চিঠির ব্যাপারটা ঘটনা হিসেবে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে, তাহলে মিসেস সিমিংটনের খুনী কে? এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির ওপর প্রথম সন্দেহ জাগে সে হল স্বামী। আর যদি শুনি তার বাড়িতে একজন অতি আকর্ষণীয় যুবতী গভর্নের্স রয়েছে। মিঃ সিমিংটন অবদমিত ভাবাবেগশূন্য মানুষ...একজন ঝগড়াটে উকট স্নায়ুরোগী স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করতে করতে হঠাৎ-ই আসে যৌবনময়ী প্রাণীটি। আর ঐ বিশেষ বয়সে ভদ্রলোক সেই মহিলার প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করতে চাইলে, একমাত্র সমাধানের উপায় পথের কাঁটা স্ত্রীকে খতম করা।

ফৌজদারী অপরাধের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি চালাকি করে এক অস্তিত্বহীন বেনামী পত্রলেখককের সৃষ্টি করলেন, যাতে পুলিশের সন্দেহ কোনো মহিলার ওপর পড়ে। প্রত্যেকটা চিঠিই মেয়েমানুষের মতো করে লেখা, গত বছরের মামলায় ব্যবহৃত চিঠিগুলোর নকল করে লেখা হল।

পুলিশের কৌশলগুলোর (যেমন–হাতের ছাপ, টাইপের অক্ষর) হাত থেকে বাঁচতে তিনি টাইপ মেশিনটা মহিলা ইনস্টিটিউশনে দান করার আগেই সমস্ত খামগুলো টাইপ করে রেখেছিলেন। হয়তো কোনো একদিন লিটল ফার্জে গিয়ে সুযোগ বুঝে ঐ বইটার পাতাগুলো কেটে এনেছিলেন।

অবশেষে বিষকলম প্রতিষ্ঠা পেল। তবে তিনি আন্দাজ করতে পারেননি যে আগনেস তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরে আসবে।

-ঐ অ্যাগনেস মেয়েটি আক্ষরিক অর্থে কিছুই দেখেনি। সে তার ছেলেবন্ধুটির ক্ষমা চাওয়ার জন্যে ফিরে আসার অপেক্ষায় রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল। আর একটা ব্যাপার, ঐ বাড়িতে কেউই আসেনি, ডাকপিয়ন বা অন্য কেউ। ঢিমে বুদ্ধির জন্যেই ওর বুঝতে একটু সময় লেগে যায়। কারণ সে চোখের সামনে মিসেস সিমিংটনকে চিঠি পেতে দেখেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, উনি আসলে চিঠি পাননি?

নিশ্চয়ই নয়। তিনি লাঞ্চের পর সায়াটিকার ব্যথা উপশমের জন্যে পুরিয়া খেতেন, মিঃ সিমিংটন তার ওপরেরটায় সায়ানাইড মিশিয়ে রাখলেন। তার একমাত্র কাজ বাকি রইল, এলসি বাড়ি ফেরার আগে বউয়ের নাম ধরে ডেকে সোজা তার ঘরে চলে গিয়ে স্ত্রী যে গ্লাসে জল খেতেন, ঐ গ্লাসে একদানা সায়ানাইড ফেলে বেনামী চিঠিটা পকেট থেকে বের করে দলা পাকিয়ে চুল্লির দিকে ছুঁড়ে ফেলা।

আর মিসেস সিমিংটনের লিখে যাওয়া কাগজটা একেবারে ধাপ্পা। মিঃ সিমিংটন কোনো এক সময় তার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো বার্তা পেয়েছিলেন যে বার্তায় ঐ কথাটা ছিল, আর পারছি না–তিনি প্রয়োজনীয় কথাগুলো চিঠি থেকে ছিঁড়ে নিলেন।

জোয়ানা বলল, অ্যাগনেসকে খুন করার প্রয়োজনটা নিশ্চয় ছিল না?

–মিঃ সিমিংটন নিঃসন্দেহেই শুনেছিলেন মেয়েটা প্যারট্রিজকে ফোনে বলছে, মনিব গিন্নির মৃত্যুর পর থেকে সে বিভ্রান্তবোধ করছে। সিমিংটন কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি।

-কিন্তু আপাত নজরে তো তিনি সারা বিকেলটা অফিসে ছিলেন।

–আমার ধারণা অফিস যাওয়ার আগেই তিনি মেয়েটাকে খুন করেন। মিস হল্যান্ডকে দেখিয়ে তিনি হলঘরে ঢুকেই সামনের দরজা খুলে আবার বন্ধ করে চট করে ঢুকে পড়েন ছোটো কামরাটায়। যেন তিনি বেরিয়ে গেলেন। অ্যাগনেস সামনের দরজা খুলতে গেলে পেছন থেকে নোড়া দিয়ে আঘাত করে, নিকি ঢুকিয়ে খুন করে মেয়েটাকে কাবার্ডে ঢুকিয়ে রেখে হনহন্ করে অফিসে চলে যান।

জোয়ানা জানালো, পুলিশ আওয়েনের ডিসপেনসারি থেকে হারানো নোড়া আর শিকটাও পেয়েছে। ওগুলো সিমিংটনের দফতরের একটা পুরানো জংধরা দলিলের বাক্সের মধ্যে পেয়েছে।

এদিকে এইনি গ্রিফিথের গ্রেপ্তারের দিন সিমিংটনের হাতে অ্যাটাচির মধ্যে বইয়ের কাটা পাতাগুলো আর নোড়াটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগের ঘটনা একটু বলি, মিস হল্যান্ড তাকে লেখা চিঠিটা মিঃ সিমিংটনকে দেখালে তিনি বুঝলেন ওটা কে লিখেছে। এরপর

তিনি চিঠিটা থানায় নিয়ে গেলে আরো নিঃসন্দেহ হন এই শুনে যে, পুলিশ মিস গ্রিফিথকে ঐ চিঠিটা টাইপ করতে দেখেছে। এমন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন না।

–তিনি সেদিন সপরিবারে এইমির বাড়িতে চা খেতে গেলেন। হলঘর দিয়ে হেঁটে এইমি আর পুলিশের পেছনে আসার সময় দু-এক মিনিটের মধ্যে তিনি ঐ ছেঁড়া পাতা আর নোড়া এইমির কাবার্ডে লুকিয়ে দিলেন।

-কিন্তু মিস মারপল, আপনি এ ব্যাপারটায় মেগানকে জড়ালেন কেন? আমি বললাম।

–লোকটার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছিল না। তাই চেয়েছিলাম এমন কাউকে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যার সাহস ধূর্ততা আর প্রচণ্ড বুকের পাটা আছে। ঐ মেগানই ছিল আমার হাতিয়ার।

-বুঝলাম মিস মারপল।

.

# ১৫.

হাইস্ট্রিটের সকালবেলা।

–মিস এমিলি বারটন মুদির দোকান থেকে বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে আসছেন। চোখজোড়া উত্তেজনায় ভরা।

-ওঃ মিঃ বার্টন, এখন বড়ো ব্যস্ত আছি ভাই। ভাবুন তো শেষ অবধি সত্যি সত্যি আমি সাগর পাড়ি দিতে চলেছি।

আশা করি বেড়ানোটা খুব উপভোগ করবেন।

-একলা বেরুতে কি সাহস হত! কিন্তু সৌভাগ্য আমার কিভাবে সব কিছু হয়ে গেল নিজেই জানি না। অনেক দিনের চিন্তা ছিল, লিটল ফার্জ বেচে দেবার, আমার তো তেমন সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু অচেনা উটকো লোক সেটা কিনে থাকবে এটা বরদাস্ত করতে পারতাম না। এখন আপনিই যখন ও বাড়িটা কিনে নিলেন আর মেগানের সঙ্গেই ওখানে থাকবেন–ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। তারপর এইমি...এতসব ভয়ানক ঝামেলার পর নিজেকে নিয়ে কি করবে তা ভাবতে না পেরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজী হয়ে গেল। ওর ভাইটিও আপনার বোনকে বিয়ে করে আমাদের এই লিমস্টকে যে আপনারা

দুজনে থাকতে মনস্থির করেছেন ভাবতে আনন্দ হয়। আমার সত্যিই ধারণা সব কিছু একসময় পরম মঙ্গলের মধ্যে শেষ হয়।

হাইস্ট্রিট ধরে হেঁটে যাই। সিমিংটনদের বাড়ির ফটক দিয়ে ভেতরে যাই। মেগান আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসে।

খুব রোমান্টিক কিছু হলো না আমাদের, কারণ ওর সঙ্গে ছিল পেল্লায় আকারের একটা বুড়ো ইংলিশ শীপডগ।

-দরুণ কুকুর না? মেগান বলল।

–ওটা বুঝি আমাদের?

-হ্যাঁ, জোয়ানা আমাদের বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছে। কত মজার্দার সব উপহার পেয়েছি জানো? ঐ যে নোমওয়ালা উলের জিনিসটা, ওটা পেয়েছি মিস মারপলের কাছ থেকে। আর চমৎকার ঐ ক্রাউন-ডার্বি চায়ের সেট, ওটা পাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া। আর এলসি আমাকে একটা রুটি সেঁকা টোস্টার

-যে যেমন তেমনি, বলে উঠি আমি। বিয়ের উপহার তো আগেভাগে পেলে এখন যদি মন বদল করো, তাহলে যার যার জিনিস ফেরৎ পাঠাতে হবে।

–আমি মন বদলাবো না। আরো কি এসেছে শুনবে? মিস কলপ পাঠিয়েছেন একটা মিশরীয় পাথরের ভ্রমণ।

–মৌলিক চিন্তা করেন তো! আমি বললাম।

–ওঃ হো! আসলটাই শোননি। প্যারট্রিজ একটা ছুঁচের কাজ করা চায়ের টেবিলের ঢাকা পাঠিয়েছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, জোয়ানা কুকুরের নিজের বগলেশ আর শেকল ছাড়াও একজোড়া বকলেশ-শেকল পাঠিয়েছে। কেন? বললাম, ওটা ওর ছোট্ট রসিকতা।